কারু সঙ্ঘ

শান্তিনিকেতন শিল্পী সমবায়

পুলক দত্ত

কা রু স ঙ্ঘ

শান্তিনিকেতন শিল্পীসমবায়

কারু সঙ্ঘ

শান্তিনিকেতন শিল্পীসমবায়

পুলক দত্ত

রবীন্দ্রভবন
বিশ্বভারতী। শান্তিনিকেতন

প্রকাশ : ১৪০৮ শিল্পোৎসব
প্রচ্ছদ : পুলক দত্ত

পঁচিশ টাকা

কর্মসচিব শ্রীদ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত ও
শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে শ্রীঅভিজিৎ সেনগুপ্ত মুদ্রিত।

ভূমিকা

শিল্পী-গ্রামের কথা ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, রূপ দিয়ে যেতে পারেন নি। সেই ভাবনাকেই বাস্তবে অনুবাদ করেছিলেন আচার্য নন্দলাল। জর্মনির 'বাউহাইস' আন্দোলনও হয়তো প্রেরণায় ছিল তাঁর। ১৯৩০ সালে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হয় শিল্পী-উপনিবেশ 'কারুসঙ্ঘ'।

সময়ের দিক থেকে স্থায়ী হয় নি এ-সঙ্ঘ; যুক্ত ছিলেন যাঁরা, ভাবনা আর কাজই তাঁদের বিভোর করেছিল; এর তথ্যমূলক বিবরণ সংগ্রহ ক'রে রাখার দিকে দৃষ্টি ছিল না তাঁদের। তা সত্ত্বেও, নিতান্ত অভাবিতভাবেই র'য়ে গিয়েছে কিছু উপকরণ। পাঠভবনের শ্রীপুলক দত্ত সেগুলি সংগ্রথিত ক'রে একটি নাতিদীর্ঘ ইতিকথা রচনা করেছেন।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস পরিণতি পায় নি। কিন্তু যদি এই ভাবনাসূত্র আজও গ্রহণযোগ্য— অবশ্যই সময়োচিত পরিবর্তনের মাধ্যমে— মনে হয় নবীন প্রজন্মের শিল্পীদের, তাহ'লে নতুন ক'রে শুরু করা যায় কি এই প্রকল্প? এ-বই যদি সেদিকে প্রাণিত করতে পারে তাঁদের, তাহ'লে সার্থকতর হবে এই প্রকাশনা। সে-সম্ভাবনা উন্মুক্ত ক'রে দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রভবনকে সাধুবাদ।

শান্তিনিকেতন
২৩ অগস্ট ২০০১

শ্রীসুজিতকুমার বসু
উপাচার্য : বিশ্বভারতী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণাপত্র লিখতে বহু মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পেয়েছি। রবীন্দ্রভবন, কলাভবন ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সহযোগিতায় এই লেখা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

ইন্দুসুধা ঘোষ, শ্রীবনবিহারী ঘোষ, শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ, যমুনা সেন, শ্রীঋতেন মজুমদার, শ্রীননীগোপাল ঘোষ, শ্রীমতী অরুন্ধতী ঠাকুর, শ্রীঅনাথনাথ দাস, শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায়, শ্রীআশীষ হাজরা, শ্রীরামচন্দ্র রায়, শ্রীমতী ইন্দ্রাণী ঘোষ, শ্রীপুলক দেববর্মন, শ্রীত্রিলোচন ঘোষ, শ্রীমতী শ্যামলী খাস্তগীর, শ্রীসুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুপ্রিয় ঠাকুর, শ্রীমতী শুভ্রা ঠাকুর, শ্রীমতী শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী আর. শিবকুমার, শ্রীনির্মলেন্দু দাস, শ্রীসুমন্ত্র সেনগুপ্ত, শ্রীদেবব্রত দত্ত, শ্রীসুরঞ্জন বসু, শ্রীমতী সুমিতা মুখোপাধ্যায়।

গবেষণাপত্রটি বই আকারে প্রকাশিত হল শ্রীস্বপন মজুমদারের আগ্রহে।

সেপ্টেম্বর ২০০১ — পুলক দত্ত

শান্তিনিকেতন

সূ চী প ত্র

ভূমিকা

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণে যাওয়াকে নন্দলাল বসু শিল্পশিক্ষার একটি জরুরি অঙ্গ ব'লে মনে করতেন। এইজন্যে তিনি মাঝে-মাঝেই ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন এইধরনের ভ্রমণে। একসঙ্গে অনেক কাজ ক'রে আবার ফিরে আসতেন শান্তিনিকেতনে। কখনো কাছাকাছি কোনো জায়গায় তাঁবু ফেলে সকলে একসঙ্গে কাটাতেন কয়েকটা দিন। একবার কারুসঙ্ঘের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে গোয়ালপাড়ার কাছে তাঁবু ফেলে কিছুদিন সকলে মিলে থেকে অনেক কার্ড এঁকেছিলেন। সেইবারের পৌষমেলায় সেই কার্ড বিক্রি ক'রে দুশো টাকা আয় হয়েছিল, সেই টাকা দিয়ে নতুন একটি তাঁবুও কেনা হয়েছিল। কলাভবনে এই ভ্রমণের পরম্পরা আজও অব্যাহত আছে। তফাত একটাই— কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী তা এখন বাৎসরিক শিক্ষামূলক ভ্রমণ।

এইধরনের ভ্রমণে একসঙ্গে কাজ করা, সংগ্রহালয় দেখা, প্রাচীন স্থাপত্যকর্ম দেখার সঙ্গে আরও অনেক-কিছু জড়িয়ে থাকে। একসঙ্গে রান্না করা, খাওয়া— একসঙ্গে গান করা— নতুন দেশ, মানুষ দেখা— খুব কাছের মানুষকে নতুনভাবে চেনা— সহযোগিতাকে গ্রহণ ক'রে প্রতিযোগিতাকে সহজেই অস্বীকার করতে শেখা— আরো কত কী জড়িয়ে থাকে এক-একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে। অনেকগুলি ব্যক্তির যোগফল না-হয়ে এই সম্মিলিতভাবে দিন কাটানোর অভিজ্ঞতা একটি গুণগত তফাতে উত্তীর্ণ হয়ে পূর্ণতা পায়।

১৯৭৯ সালে কলাভবনের মাস্টারমশাইরা এইরকম এক ভ্রমণে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যান দক্ষিণভারতে। ১৩ জানুয়ারি কলাভবনের দল মাদ্রাজ থেকে রওনা দেয় মহাবলীপুরমের দিকে। পথে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ানো হয় চোলামণ্ডল শিল্পীগ্রামে। চোলামণ্ডল দেখে সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সেই বয়সে সকলেরই মনে হতে থাকে বন্ধুরা

মাসোজীর পিঠে নন্দলাল, কোপাই নদী ১৯৪২

মিলে একসঙ্গে শিল্পচর্চা করার কোনো বিকল্পই নেই। মানসিকতার মিল থাকলে, একসঙ্গে কাজ করার আনন্দ যেন দ্বিগুণ হয়ে যায়। মুগ্ধ হয়ে চোলামণ্ডল দেখার সময় এক মাস্টারমশাই বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ কারুসঙ্ঘকে একটা শিল্পীদের গ্রাম হিসেবে ভেবেছিলেন। বিনোদবিহারীর 'আধুনিক শিল্পশিক্ষা' অনেকেরই পড়া ছিল, তবুও এই চাঞ্চল্যকর তথ্যটি যেন মনের গভীরে প্রবেশ করে নি। চোখের সামনে এমন একটা চমৎকার শিল্পীদের গ্রাম দেখে— শিল্পীদের গ্রাম গড়ার স্বপ্নটা ভাসতে থাকে অনেকেরই মনে।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পীগ্রামের প্রস্তাব সম্বন্ধে বিনোদবিহারীর ওই বইটি ছাড়া আর কোথাও খোঁজ পাওয়া গেল না। কাজেই কলাভবনের শিক্ষকমশাইয়ের সেই উক্তির পরেও খুঁজে দেখার চেষ্টাই হ'ল না কারুসঙ্ঘের গোড়াটা। আজকের ভারতবর্ষে ছবির ব্যবসায়ীদের, সাংস্কৃতিক উৎপাদনকে পণ্যে রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গ্যালারিওয়ালাদের, এমনকি ক্লাস চলাকালীনও শিল্পশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঘরে-ঘরে অবাধে চলাফেরার অধিকারের প্রতিক্রিয়ায়— যে-শান্তিনিকেতন একদিন ভারতবর্ষের শিল্পীদের যথার্থ আধুনিক ভারতীয় শিল্পী হিসেবে হাঁটতে শিখিয়েছিল, সেখানকার শিল্পচর্চাতেও শিল্প এবং শিল্পীর, পণ্যে রূপান্তর ও যান্ত্রিক উৎপাদনের ছোঁয়া লাগার লজ্জায়— কারুসঙ্ঘের ইতিহাস খোঁজার কাজটা অনেক জরুরি হয়ে পড়ল। আর এমন একটা সময় এই খোঁজাটা শুরু হ'ল যখন প্রায় অনেক-কিছুই হারিয়ে গেছে, অনেক মানুষই চ'লে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পীগ্রামের ভাবনা কোনোদিন রূপ পায় নি। কিন্তু নন্দলাল তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পাঁচ বিঘে জমি কিনে রূপ দিয়েছিলেন কারুসঙ্ঘের শিল্পী-উপনিবেশের পরিকল্পনাকে। প্রাথমিক কাজকর্ম সবই শুরু হয়েছিল— যদিও সকলে মিলে একসঙ্গে থাকা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। ১৯৩০ সালের সেই কারুসঙ্ঘ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি, তার খুব গভীর প্রভাবও পড়ে নি তৎকালীন ভারতবর্ষের শিল্পীসমাজে।

চারুশিল্প ও কারুশিল্পের মধ্যে যে-বিভাজন তাকে নন্দলাল ও তৎকালীন শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা কৃত্রিম ব'লে মনে করতেন। কারিগরিবিদ্যার প্রতি নন্দলাল বিশেষভাবে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। বিভিন্ন গ্রাম থেকে কারিগর নিয়ে এসে ছাত্রদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল কলাভবনের সূচনা-পর্বে। আরো পরে রাজস্থানের নরসিংহলালকে এনে জয়পুরী ফ্রেস্কো পদ্ধতি অনুশীলন করেন এখানকার শিল্পীরা। সারা জীবন ধ'রে নন্দলাল পরম্পরাগত কারিগরিবিদ্যার পাঠ নিয়েছেন। লোকশিল্প থেকে নান্দনিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে নীরবে পাঠ নিয়েছেন সৌন্দর্যবোধের। ১৩ মে ১৯৪৩ তারিখের একটি চিঠিতে তাঁর ছাত্রী ইন্দুলেখা ঘোষকে নন্দলাল লিখছেন, "... এরা যে খোট্টা (গরীব, মূর্খ, মার্জিত নয়) বড় দয়া করে দেখছিলাম। আমি বড় আর্টিষ্ট কত দেখেছি, কত বুঝেছি, এরা আমায় কি খুশী করতে পারে? হঠাৎ একটি ছোট্ট মুখে এই গহনাটি দেখলাম। (পানের মতো গহনাটি আঁকা আছে) এখন বুঝলাম আর্ট কোথায় খুঁজতে হবে।" [১] নন্দলাল নিজে একজন দক্ষ কারিগর ছিলেন।

সুস্থ শিল্পচর্চাকে রক্ষা করতে এবং আধুনিক ইয়োরোপের নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক গঠনের সঙ্গে শিল্পকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে চারুশিল্প ও কারুশিল্পের পুনর্মিলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন জর্মান স্থপতি Walter Gropius। তাঁর নিজের ভাষায়, "In the spring of 1919 the author assumed the directorship of the Grand Ducal Saxon Academy for Pictorial Art as well as of the Grand Ducal Saxon Academy for Arts and Crafts and united them under the new name of 'State Bauhaus'." First Proclamation of the Weimar Bauhaus-এ উচ্চারিত হ'ল, "ARCHITECTS, SCULPTORS, PAINTERS, WE MUST ALL TURN TO THE CRAFTS."

"Art is not a 'profession'. There is no essential difference between the artist and the craftsman. The artist is an exalted craftsman. In rare moments of inspiration, moments beyond the

control of his will, the grace of heaven may cause his work to blossom into art. But proficiency in his craft is essential to every artist. Therein lies a source of creative imagination." এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য বিক্রিরও ব্যবস্থা ছিল। "The last Leipzig Fair was a distinct success. All Bauhaus workshops were busy for five months filling orders. At this time (1924) more than fifty firms were buying Bauhaus products to such an extent that the scarcity of machinery and capital made it impossible to fill all orders." [২] এমনকি বাউহাউস শিল্পীসমাজের জন্য বিভিন্ন কর্মশালা ও বাসস্থানের ব্যবস্থাসহ একটি উপনিবেশেরও পরিকল্পনা করা হয়। তৎকালীন সরকার এই উদ্দেশ্যে একটি সব্‌জি ও ফলের চাষের জমি লীজ দেন। জর্মানিতে চরম মুদ্রাস্ফীতির যুগে বাউহাউসের ছাত্রছাত্রীরা এই জমিতে চাষ ক'রে বাউহাউস রান্নাঘরে সব্‌জি সরবরাহ করেন। ১৯২৩ সালে 'Am Horn' নামক একটি পরীক্ষামূলক বাড়িও তৈরি হয়। কিন্তু সরকারি অনিচ্ছা এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে এই পরিকল্পনা বেশিদূর এগোতে পারে নি।

১৯১৯ সালেই শান্তিনিকেতনে কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। পেশার তাগিদে নয়, জীবনের তাগিদে শিল্পশিক্ষার উদ্দেশ্যে কলাভবনকে একটি সঙ্ঘের আদর্শে পরিচালিত করেন নন্দলাল। দুই ভিন্ন দেশে ভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত ব'লেই দুটি ভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য অনেক, তৎসত্ত্বেও একইসময় পৃথিবীর দুই প্রান্তে উঠে-আসা কলাভবন ও বাউহাউসের মধ্যে মূলগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

এর অনেক বছর পরে, ১৯৬৬ সালের ১৬ এপ্রিল, চুরাশি বছর বয়সে নন্দলালের মৃত্যু হয়। সেই বছরের ১৮ এপ্রিল মাদ্রাজ শহরের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে শিল্পী কে সি এস পানিকরের নেতৃত্বে প্রায় আট একর জমি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় চোলামণ্ডল শিল্পীগ্রাম।

১৯৬৫ সালে মাদ্রাজের একদল শিল্পী প্রতিষ্ঠা করেন আর্টিস্ট্‌স্ হ্যান্ডিক্রাফ্‌ট্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন। তাঁরা একটি প্রদর্শনী ক'রে তার থেকে উপার্জিত অর্থ নিয়ে জমির সন্ধান করেন ও ১৯৬৬ সালে জমি কিনে

শিল্পীগ্রাম গড়বার কাজ শুরু করেন। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় তাঁদের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁরা জানান, "...to promote, encourage, propagate, extend, assist, reward the creative talents of painters, sculptors, graphic artists in artistic crafts...and generally to enhance the aesthetic content of contemporary Indian handicrafts..."। চোলামণ্ডল সম্পর্কে শ্রীমতী অদিতি দে লেখেন, "It was born of the artists' eternal dilema— of how to ward off starvation without selling their souls or compromising their skills... He (Paniker) emphasized that the arts and crafts have always existed side by side in India, and the greatest Indian craftspeople have also been her greatest artists."। সমবায় নীতির ওপর ভিত্তি ক'রে এই সংগঠন পরিচালিত হয়।

আমরা এই প্রবন্ধমালার প্রথম অধ্যায়ে চেষ্টা করব শান্তিনিকেতন কারুসঙ্ঘ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য একত্র ক'রে সেই কারুসঙ্ঘের রূপটিকে চিনে নিতে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনুসন্ধান করব শিল্পীগ্রাম বা শিল্পীগোষ্ঠীর ধারণা ও এই বিশেষ জীবনদর্শনের প্রবাহটিকে— যে প্রবাহের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছিল কারুসঙ্ঘ এবং তৃতীয় অর্থাৎ শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করব আজকের ভারতবর্ষে এইধরনের জীবনযাপনের তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা।

উল্লেখপঞ্জি

১ নন্দলাল বসু, *দৃষ্টি ও সৃষ্টি* (কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৯২), পৃ. ২৬৯।

২ বাউহাউস সম্পকীয় সমস্ত তথ্য নিম্নলিখিত বই থেকে গৃহীত : Herbert Bayer, Walter Gropius, Ise Gropius, Eds., *Bauhaus 1919-1928* (New York : The Museum of Modern Art 1986).

কারুসঙ্ঘ : তথ্য ও ইতিহাস

১৯৩০ সালে শান্তিনিকেতনে কারুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে কেউ আলোচনা না-করায় এই সঙ্ঘ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিষয় জানতে পারা প্রায় অসম্ভব। সেইসময় যাঁরা সদস্য ছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগই আজ জীবিত নেই। কারুসঙ্ঘ শুধুমাত্র একটি শিল্পী উপনিবেশ বা শিল্পীদের সঙ্ঘমাত্র নয়— কারুসঙ্ঘ একটি আদর্শ ও জীবনযাত্রার দর্শনের নাম। আজকের পরিস্থিতিতে এই আদর্শ ও দর্শন আরো অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। তাই, সেই সময়কার পত্রপত্রিকা, তখনকার শিল্পীদের কিছু লেখা, তৎকালীন কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে কারুসঙ্ঘের উদ্দেশ্য, কার্যপ্রণালী ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয় বোঝবার চেষ্টা করব আমরা এই অধ্যায়ে।

১৯২০-২১ সাল নাগাদ নন্দলাল শান্তিনিকেতন কলাভবনে আচার্য পদে যোগ দেন। চারুশিল্প, কারুশিল্প, মঞ্চসজ্জা, আশ্রমের উৎসব-অনুষ্ঠান, কলাভবনের শিক্ষাপদ্ধতি, এইসব বিষয়ে একইসঙ্গে গভীরভাবে মগ্ন থাকতেন এই একা মানুষটি। আর এই সব-কিছুর মধ্যেই প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজখবর রাখতেন— মানুষ হিসেবে, শিল্পী হিসেবে আনন্দে বেঁচে থাকার রাস্তা খোঁজায় সাহায্য করতেন, পরামর্শ দিতেন। নিজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে লেখা নন্দলালের অসংখ্য চিঠি তাঁর এই বিশেষ দিকটি আমাদের সামনে মেলে ধরে। ১৯৩০ সালের মধ্যে নন্দলালের অনেক ছাত্রছাত্রীই এখানকার শিক্ষা শেষ ক'রে দূরে চ'লে গেছেন জীবিকার সন্ধানে। কলেজের শিক্ষা শেষ ক'রে, শুধুমাত্র ছবি বিক্রি ক'রে জীবিকা উপার্জন তখনকার দিনে প্রায় অসম্ভব ছিল। কাজেই, অনেককেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেদের শিল্পচর্চার ক্ষতি ক'রে অন্য কাজ করতে হ'ত জীবিকানির্বাহের জন্য। শিল্পীদের এই অবস্থাটা নন্দলাল মেনে নিতে পারেন নি। শিল্পশিক্ষা শেষ ক'রে তাঁর

ছাত্রছাত্রীরা কী উপায়ে স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চায় মগ্ন থাকতে পারেন এই চিন্তা থেকে জেগে ওঠে কারুসঙ্ঘের পরিকল্পনা। শ্রীনিকেতন যাবার পথের বাঁদিকে তাঁর বাড়ির সংলগ্ন পাঁচ বিঘা জমি নিয়ে নন্দলাল একটি শিল্পী-উপনিবেশ গ'ড়ে তোলার কাজে নামলেন ১৯৩০ সালে।

সমাজে শিল্পীদের শিল্পী হিসেবে বেঁচে থাকা যখন ব্যাহত হয়, বিদেশী শাসক এবং ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক স্বার্থ যখন সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তখন দলবেঁধে সমবায় ভিত্তিতে বিকল্প পরিবেশে চারুশিল্পকে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর ক'রে তোলাই শিল্পচর্চাকে জীবন্ত রাখার একমাত্র উপায়।

নন্দলালের চেষ্টায় এবং প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যে পাঁচ বিঘা জমি সংগৃহীত হয় কারুসঙ্ঘের জন্য। এর মধ্যে প্রভাতমোহন এক বিঘা এবং বিনায়ক মাসোজী এক বিঘা জমি কেনেন। বাকি তিন বিঘা জমি অন্যান্য সদস্যদের কেনার জন্য রাখা থাকে। অন্যান্য সদস্যরা অর্থ সংগ্রহ ক'রে কখনো এই জমি কিনবেন এবং বসবাস করবেন, এই ছিল উদ্দেশ্য। সঙ্ঘের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে জমি বিক্রি ক'রে দেওয়া হয়।[১] প্রথম সদস্যরা ছিলেন প্রভাতমোহনের মতে (১) সুধীর খাস্তগীর (২) রামকিঙ্কর বেইজ (৩) বিনায়ক শিবরাম মাসোজী (৪) মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (৫) হীরেন্দ্র ঘোষ (৬) কেশব রাও (৭) বনবিহারী ঘোষ (৮) ইন্দুসুধা ঘোষ ও (৯) প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক)।[২] নানাকথা : *বঙ্গলক্ষ্মী* (মাঘ ১৩৩৭) পত্রিকা থেকে জানতে পারি যে, কারুসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন (১) নন্দলাল বসু (সভাপতি) (২) প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (৪) বিনায়ক শিবরাম মাসোজী (৫) রামকিঙ্কর বেইজ (৬) ইন্দুসুধা ঘোষ। পঞ্চানন মণ্ডলের *ভারতশিল্পী নন্দলাল* (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৬৫) বইয়ে উল্লেখ দেখি, (১) সুরেন (২) মণি গুপ্ত (৩) মাসোজী (৪) বিনোদবিহারী (৫) প্রভাতমোহন ও (৬) ইন্দুসুধা হলেন এই সঙ্ঘের সদস্য। যদিও প্রভাতমোহন খুব স্পষ্ট ক'রে লেখেন, "বিনোদবাবু কিন্তু কারুসঙ্ঘে যোগ

মাসোজী

রামকিঙ্কর

দেন নি। যদিও তাঁর অর্থের প্রয়োজন কারো চেয়ে কম ছিল না। তবু অন্যের নির্দেশে শিল্পসৃষ্টিতে তাঁর অনীহা ছিল।" [৩]

উদ্দেশ্য

নন্দলাল মনে করতেন কারুশিল্প একদিকে যেমন জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর ক'রে তোলে, অন্যদিকে অর্থাগমেরও পথ ক'রে দেয়। কারুশিল্পের মধ্যে দিয়ে যে-অর্থ উপার্জন হয় তাই দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করলে চারুশিল্পের চর্চা সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হয়ে ওঠে।[৪] যমুনা সেন বলেন, "আর এটা মাস্টারমশাইয়ের সবসময় ছিল যে ছবি এঁকে কারুর পেট ভরবে না, তার জন্য craftটা সঙ্গে-সঙ্গে থাকলে, সেটা হাতের কাজে, পয়সার জন্য ওটা [কারোর ওপর নির্ভরশীল হতে হবে না] ...এই জন্য craftটাকে উনি ঢুকিয়েছিলেন বেশি ক'রে।" [৫]

কারুসঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য ছিল মাসের কিছুদিন কারুশিল্প এবং ফরমায়েসি কাজ ক'রে জীবিকা উপার্জন করা এবং অন্য বেশিরভাগ সময় নিজেদের শিল্পচর্চায় নিমগ্ন থাকা। এই কাজ যে একসঙ্গে সমবায়ভিত্তিতে করলেই সার্থক হ'তে পারে তা প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা অনুভব করেন এবং সেইমতো কাজ শুরু করেন। কারুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যের দুটি দিক, একটি হ'ল এখানে এমন একটি শিল্পী-উপনিবেশ তৈরি করা, যেখানে একসঙ্গে কাছাকাছি বাস ক'রে শিল্পচর্চার একটি জীবন্ত পরিবেশ তৈরি হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ ক'রে একে অপরকে সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে সম্মিলিত শিল্পচর্চা ও শিল্প অনুসন্ধান, সদস্যদের ভিতরের শিল্পীকে শুকিয়ে যাবার প্রক্রিয়া থেকে রক্ষা করবে। অন্যটি হ'ল, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কারুশিল্প এবং ব্যবহারিক শিল্পের অর্ডারের কাজ ক'রে উপার্জন ক'রে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করা এবং একটি সাধারণ অর্থভাণ্ডার গঠন করা। এই ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনে সদস্যরা বিনা সুদে টাকা ধার নিতে পারবেন এবং পরে নিজেদের আয় থেকে তা শোধ দেবেন।[৬]

পরিচালকমণ্ডলীর গঠন

কারুসঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন নন্দলাল বসু, সম্পাদক প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন বিনায়ক মাসোজী। প্রভাতমোহন ১৯৩০ সালের কয়েকমাস কাটার পরেই গান্ধিজীর 'ডান্ডি যাত্রা'য় যোগ দেন।[৭] বিনোদবিহারীর মতে তিনি শান্তিনিকেতন ছাড়েন ১৯৩২ সালে।[৮] প্রভাতমোহন শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাওয়ার পর সম্পাদকের দায়িত্ব নেন মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। মাসোজীও প্রভাতমোহনের সঙ্গে স্বদেশী করতে যান ও কিছুদিন পরে ফিরে এসে সঙ্ঘের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।[৯] কারুসঙ্ঘের পরিচালকমণ্ডলীর গঠন সম্বন্ধে এর বেশি কিছু জানা যায় না।

কাজকর্মের বিবরণ

তৎকালীন পত্রপত্রিকায় কারুসঙ্ঘের বিজ্ঞাপন ও সংবাদ থেকে তখন কী-ধরনের কাজের অর্ডার নেওয়া হ'ত তার পরিচয় পাওয়া যায়। *প্রবাসী* (শ্রাবণ ১৩৩৭) ও *আনন্দবাজার পত্রিকায়* (২৫ মার্চ ১৯৩০) উল্লেখ দেখি, "ছবি— জলবর্ণ ; তৈলবর্ণ ; বইয়ের ছবি ও বিজ্ঞাপন। মূর্তি ; সূচীশিল্প ; বাটিকের কাজ ; প্রাচীর-চিত্র ; বাসন ও গহনার নূতন ডিজাইন, দারুশিল্পের নূতন ডিজাইন, গৃহসজ্জার জন্য সকল রকম শিল্পদ্রব্যের ডিজাইন।" *Journal of the Indian Society of Oriental Art* [*JISOA*] (Vol.1, No.1, June 1933)-এ উল্লেখ পাই: "1. Painting in Water & Oil Colour 2. Illustration and cover design for books and magazines 3. Poster design 4. Design for monograms, letterheads etc. 5. Designs for ornaments, furniture, utensils etc. 6. Designs and portraits in clay, terracotta and plaster of paris 7. Embroidery 8. Batik works for handkerchiefs, handbags and door curtains 9. Fresco and Mural painting 10. Leather works. Woodcut prints done by known artists of Santiniketan are for sale. Books published by Karu Sangha are available at Santiniketan, Kala-Bhavana." ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে কারুসঙ্ঘের কাজের তালিকা বৃদ্ধি
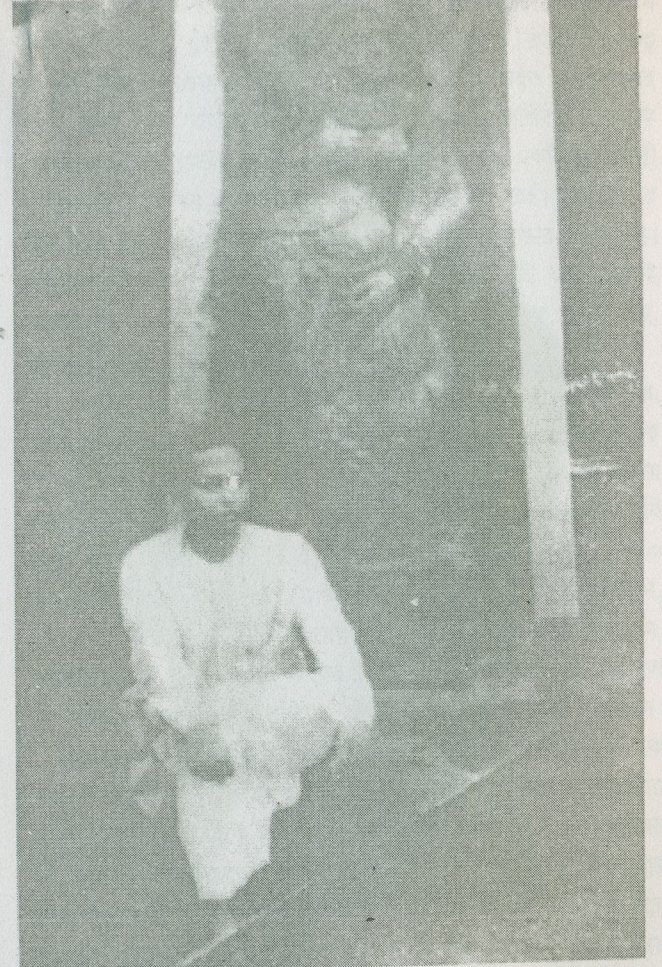
মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

সুধীর খাস্তগীর

পেয়েছে, এটা লক্ষণীয়। ঠিক কীধরনের কাজ হয়েছে তা বোঝা এখন খুব মুশকিল। প্রায় কোনো-কিছুরই নমুনা সহজলভ্য নয়, তবে কিছু-কিছু কাজের বিবরণ পাওয়া যায় বিভিন্ন শিল্পীর লেখায়। সম্ভবত কারুসঙ্ঘের প্রথম কাজ হ'ল 'স্বাস্থ্যই সম্পদ' প্রাচীর-চিত্র প্রতিযোগিতা উপলক্ষে বাদামি কাগজে পোস্টার কালারে আঁকা নন্দলালের ছবি, একটি অল্পবয়সী মা তার ছোট্ট মেয়ের হাত ধ'রে নাচছে এবং তাকে নাচাচ্ছে। কারুসঙ্ঘের সীল দিয়ে এই ছবি জমা পড়েছিল এবং একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছিল। এই টাকা দিয়েই কারুসঙ্ঘের অর্থভাণ্ডার খোলা হয়। এই অর্থ থেকেই সঙ্ঘের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি— সেট্ স্কোয়ার, টি স্কোয়ার, ড্রইং বাক্স, কাপড় ইত্যাদি কেনা হয়।

প্রথমদিকে নিয়মিত আয় হ'ত 'পুস্তক প্রসাধন' থেকে। রামকিঙ্কর, সুধীর খাস্তগীর, মাসোজী, প্রভাতমোহন ও কেশব রাও তিন টাকা থেকে দশ টাকা মূল্যে অনেক বইয়ের ছবি এঁকেছিলেন সেই সময়। গুরুসদয় দত্তের 'চাঁদের বুড়ী' নামক বইটিতে রামকিঙ্করের কয়েকটি চমৎকার ছবি আছে ব'লে জানা যায়। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় আষাঢ়, ১৩৪০ (১৯৩৩) সালে। পুনর্মুদ্রিত হয় আষাঢ়, ১৩৯৫ (১৯৮৮) ও আশ্বিন, ১৪০২ (১৯৯৫) সালে। বইয়ের শুরুতে গুরুসদয় দত্ত লেখেন, "শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় তাঁর অনুপম তুলিতে বইটির প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিয়াছেন। ... অন্যান্য ছবি কারুসঙ্ঘের শিল্পীগণ কর্তৃক অঙ্কিত।" 'অন্যান্য ছবি' কে কোন্‌টি এঁকেছেন, আজ তা শুধু অনুমানই করা চলে। যদিও কারুসঙ্ঘের আদর্শ অনুযায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত না-করাই বাঞ্ছনীয়। সে যুগের তুলনায় এই বইয়ের অলংকরণের স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে লাগাবার জন্য রামকিঙ্কর সিমেন্টে ঢালাই করে অজন্তার ধরনে দুটি হাঁসের মূর্তির রিলিফ করেছিলেন, তার থেকে আয় হয়েছিল পঞ্চাশ টাকা। অর্ধেন্দ্রকুমারের বাড়িতে সেগুলি লাগানো হয়েছিল, পরে 'বাটা' কোম্পানির বিজ্ঞাপনে তা ঢাকা পড়ে। কালিকলমের ছবি ও

রঙিন ছবিরও ফরমাস আসত। নন্দলালের আঁকা কাবুলিওয়ালা ও মিনুর ছবি দশ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। ছুঁচের ও কাপড়ের কাজ, বাটিক করা চামড়ার থলি, বটুয়া প্রভৃতি বিক্রি হ'ত। নন্দলালের পূর্বোক্ত ছবিটি কে কিনেছিলেন, কারুশিল্পের বিভিন্ন কাজের ফরমাস কোথা থেকে কারা করতেন তা জানতে পারা আজ প্রায় অসম্ভব। কারুসঙ্ঘ থেকে ইন্দুসুধা ঘোষের সূচী-শিল্পের নকশার বই 'সীবনী' প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে।[১০] বইটির পরিচয় লিখে দেন অবনীন্দ্রনাথ এবং রঙের ব্যবহার সম্বন্ধে ইন্দুসুধা চমৎকার একটি নিবন্ধ লেখেন। এক দিকে প্রকৃতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ, অন্য দিকে ব্যক্তিগত রুচি ও স্বাতন্ত্র্য— নন্দলাল ও কলাভবনের শিক্ষার এই বিশেষ ধারাটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় ইন্দুসুধার লেখায়। এই লেখা থেকে নন্দলালের ডিজাইনের দর্শন ও শান্তিনিকেতনে ডিজাইন চর্চা সম্বন্ধেও একটা ধারণা তৈরি হয়। পরে বিশ্বভারতী, হীরেন ঘোষের 'ছুঁচের ফোঁড়' বই প্রকাশ করে। নন্দলাল, হীরেন ঘোষের বইও কারুসঙ্ঘ থেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[১১] 'ভারতশিল্পী নন্দলাল' বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে জানতে পারি যে, সারনাথের বৌদ্ধ মূলগন্ধকুটিবিহারে মূর্তি ও ফ্রেস্কো করার অর্ডার আসে। ঠিক হয় নন্দলাল অন্যদের সাহায্যে ফ্রেস্কো করবেন আর মূর্তি করবেন রামকিঙ্কর। আইনগত বাধার জন্য নন্দলাল কাজ করে উঠতে পারেন নি। রামকিঙ্করের মূর্তিও নিশ্চয়ই সেই একই কারণে করা হয় নি।

কারুসঙ্ঘ পরিচালনায় প্রভাতমোহনের ভূমিকা

কারুসঙ্ঘ সম্বন্ধে যে-কটি লেখা পাওয়া যায় তা থেকে এবং পুরোনো কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা ব'লে এই কথাটাই পরিষ্কার হয় যে, কারুসঙ্ঘের পক্ষ থেকে অর্ডার সংগ্রহ করা, নিয়মিত কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ইত্যাদি ব্যাপারে সব থেকে বেশি তৎপর ছিলেন প্রভাতমোহন। কারুসঙ্ঘ শুরু হবার আগে থেকেই তিনি "ফরমাসী পুস্তক প্রসাধনের কাজে বিজ্ঞাপনী ছবি, প্রাচীর চিত্র প্রভৃতি এঁকে স্বাধীন ভাবে

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
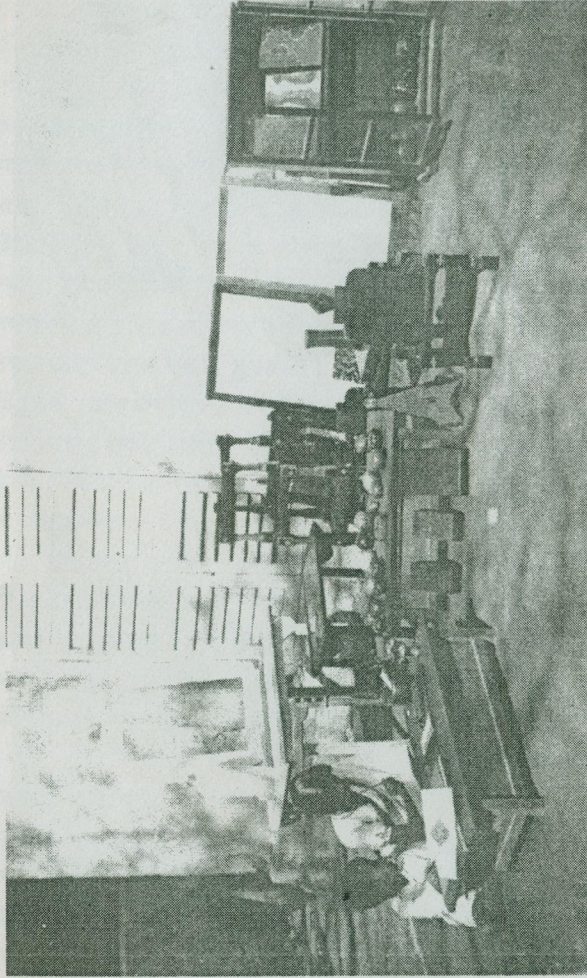
ইন্দুসুধা ঘোষ

কিছু কিছু উপার্জন" করতে আরম্ভ করেন। কলকাতার বুক কোম্পানি ও অন্যান্য প্রকাশনালয়ের সঙ্গেও প্রভাতমোহনেরই যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ— তাই নিয়মিত অর্ডারও পাওয়া যেত। শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ কলাভবনের ছাত্র হিসেবে যোগ দেন ১৯৩১ সালে, তিনি বলেন, "... প্রভাতদা incharge ছিলেন, প্রভাতদা বাইরে ঘুরে ঘুরে কিছু order collect করতেন, আমরা সে সম্বন্ধে বেশি কিছু জানি না।... ওই কারুসঙ্ঘ কিন্তু ছিল অন্য রকম। তার একটা publicity ছিল অন্যরকম এবং তার প্রধান ছিলেন প্রভাতদা।... কাজেই সেই commercial side-টা প্রভাতদা lead নিয়ে করেছেন— মাস্টারমশাইয়ের instruction মতো, মাস্টারমশাইয়ের suggestion মতো।" [১২] নন্দলালের কন্যা যমুনা সেন বলেন, "প্রভাতদাই ওটার ম্যানেজারি করতেন, সেক্রেটারি ছিলেন, হিসেবপত্র রাখতেন, সব করতেন। এবং জমিজমা কেনাটেনা, সে বাবার সঙ্গে উনিই করেছিলেন।" [১৩] বিনোদবিহারীর মতে, "Sri Pravat Mohan Banerjee was the principal force behind the founding of the Sangha." [১৪] নন্দলালের কারুসঙ্ঘের পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া এবং তাকে কার্যকর রাখার পিছনে প্রভাতমোহনের দান অনস্বীকার্য। শান্তিনিকেতনের সদস্য-শিল্পীরা মূলত থাকতেন কাজের দায়িত্বে, এ-কথা অনুমান করা অসংগত হবে না। শিল্পী সদস্যরা বাটিক, সেলাই, জলরঙ-তেলরঙের ছবি, পুস্তক প্রসাধন, প্রাচীর-চিত্র ইত্যাদি নিজেরাই করতেন, এ ছাড়াও তৎকালীন কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের (যাদের "অবস্থা সত্যি খারাপ, খাবার পয়সা নেই") দিয়ে অনেক সময় কাজ করানো হ'ত। গরীব ছাত্রছাত্রীরা তাদের ধার-করা টাকা শোধ দিতেন কাজ ক'রে।

নিয়মাবলি

নন্দলাল কারুসঙ্ঘের নিয়মাবলির একটি খসড়া তৈরি করেন। কিন্তু সেই খসড়া লিখিত আকারে কোথাও আছে কি না তার সন্ধান পাই নি। ফ্রেস্কোর মূল ডিজাইন যিনি করতেন মূল টাকা তাঁরই হাতে যেত—

৩৫ শতাংশ টাকা পেতেন শিল্পী নিজে। অন্যত্র উল্লেখ দেখি যে শতকরা ১৩ টাকা কমিশন হিসেবে জমা পড়ত সঙ্ঘের তহবিলে। কারুসঙ্ঘের করা কাজে কোথাও কোনো শিল্পীর নামের উল্লেখ থাকত না, পরিবর্তে ব্যবহার করা হ'ত নন্দলালের তৈরি কারুসঙ্ঘের সীল। এর থেকে এমন অনুমান করা অসংগত হবে না যে, বেশির ভাগ কাজই সকলে মিলে করার রীতি ছিল আর উপার্জনের টাকার ভাগ পেতেন সকল সদস্যই। শুধুমাত্র ফ্রেস্কোর মূল ডিজাইন যিনি করতেন তাঁর ক্ষেত্রে টাকাপয়সার হিসেবটা ছিল অন্যরকম। কমিশনের টাকা দিয়ে যে অর্থভাণ্ডার তৈরি হ'ল, সেখান থেকে সদস্যরা বিনা সুদে টাকা ধার পেতেন, পরে নিজের আয় থেকে তা শোধ দিতে হ'ত।[১৫] এই ধরনের নিয়মাবলির মধ্যে দিয়ে এ-কথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কারুসঙ্ঘ সব সময় কাজ করেছে গোষ্ঠী হিসেবে, কখনোই ব্যক্তি হিসেবে নয়। নন্দলালের মতন একজন শ্রদ্ধেয় মানুষের পরিচালনাধীনে সঙ্ঘের কাজ কার্যকর থাকায় সঙ্ঘের নিজেদের কাজকর্ম এবং আইনকানুন নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নিশ্চয়ই কম ছিল। কারুসঙ্ঘের অন্যান্য দিকগুলির মতোই নিয়মাবলি সম্বন্ধেও বিস্তারিতভাবে কিছু জানা যায় না। তবে এই ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য আমাদের মনে রাখা উচিত যে, "নন্দলালের পরিচালনা আইন-উদ্ভাবনের পথে হয় নি।"[১৬]

প্রত্যেক সদস্যশিল্পীই কারুসঙ্ঘ থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। অর্ডারের কাজ ক'রে গড়ে মাসে অন্তত ১০০ টাকা প্রত্যেকেই উপার্জন করতেন— এমন অনুমান করার সংগত কারণ আছে। একই সঙ্গে ঘরে ব'সে নিজেদের শিল্পচর্চার সাধনা বজায় রেখে প্রত্যেকেই খুশি ছিলেন।

কারুসঙ্ঘের স্থায়িত্বের সময়কাল

১৯৩০-এর মাঝামাঝি প্রভাতমোহন এবং মাসোজী চ'লে যান স্বদেশী করতে। সুধীর খাস্তগীর অনেকদিন এদিক-ওদিক ঘুরে বম্বে হয়ে গোয়ালিয়র সিন্ধিয়া স্কুলে যোগ দেন ১৯৩৪ সালে।[১৭] রামকিঙ্করও ১৯৩১-৩২ সাল নাগাদ দিল্লিতে একটি ইস্কুলে কাজ নিয়ে চলে যান ও ছ'মাস পরে ফিরে

আসেন। বনবিহারী ঘোষ আহ্‌মেদাবাদে কাপড়ের কলে ডিজাইনার হিসেবে যোগ দেন। ইন্দুসুধা ঘোষ শ্রীনিকেতনে শিল্পসদনে চাকরিতে যোগ দেন। প্রধানত প্রভাতমোহন শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাওয়ায় অর্ডার সংগ্রহ করা এবং অন্যান্য যোগাযোগ শিথিল হয়ে পড়ে। সদস্যদের মাসিক উপার্জন কমতে থাকে। প্রভাতমোহন বলেন, সদস্যদের আয় মাসিক একশো টাকারও নিচে নেমে আসে।[১৮] সদস্যরা বাইরে চাকরির চিন্তা করতে বাধ্য হন। ধীরে ধীরে সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ায় সঙ্ঘের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। প্রভাতমোহনের মতে, "প্রধানত সাধারণের কাজে নিঃস্বার্থভাবে কঠিন পরিশ্রম করার মনোবলের অভাবে বন্ধুরা কারুসঙ্ঘ বৎসরাধিক কাল চালাতে পারেন নি।"[১৯] কিন্তু ১৯৩৩ সালের জুন মাসে *JISOA*-য় কারুসঙ্ঘের বিজ্ঞাপন থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে কারুসঙ্ঘ বৎসরাধিক কাল চলেছিল। এই বিজ্ঞাপনের উল্লেখসহ চিঠিতে নন্দলাল প্রভাতমোহনকে লেখেন, "কারুসঙ্ঘ মরে নাই, আমাদের সঙ্গেই মরবে।" যদিও প্রভাতমোহন *দেশ* পত্রিকার পূর্বোক্ত প্রবন্ধে জানান যে, চিঠিটি ১৯৩০ সালে লেখা। তবুও আমরা ধরে নিতে বাধ্য যে এটা হয় ছাপার ভুল অথবা তাঁর স্মৃতির ভ্রম, কারণ *JISOA*-র এটিই প্রথম সংখ্যা। সম্ভবত এই চিঠিটি ১৯৩৪ সালে লেখা। চিঠিতে লিখেছেন, "বনবিহারী আহ্‌মেদাবাদে একটা মিলে ১০০ টাকার কাজ লইয়া গিয়াছে। কিঙ্কর এখন এখানেই আছে।... মাসকতক আগে সে দিল্লীতে New [Model] School-এ একটা কাজ লইয়া গিয়াছিল ১৫০৲ টাকা ও ফ্রি লজিং। কিন্তু ৬ মাস কাজ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিলাম বনিবনাও হয় নাই।... সুধীর খাস্তগীর উপস্থিত Gowalior Sindhia স্কুলে ২০০৲ টাকা মাইনায় একটা কাজ লইয়া গিয়াছেন।" সুধীর খাস্তগীর সিন্ধিয়া স্কুলে যোগ দেন ১৯৩৪ সালে। নন্দলালের লেখা এই দীর্ঘ চিঠিটির ছ'টি পৃষ্ঠা পাওয়া যায়, বাকি পাতাগুলি হারিয়ে গেছে— অন্যত্র কোথাও সন-তারিখের উল্লেখ নেই। নন্দলালের উক্ত চিঠিটি থেকে কারুসঙ্ঘ সম্বন্ধে বেশ-কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিচে উদ্ধৃত করলাম:

"কিঙ্করের বেচারার টাকা অর্দ্ধেন্দুবাবু দিলেন না, উপরন্তু আমি আনিতে গিয়াছিলাম, অপমানিত হয়ে এসেছি। অমেরিকার [আমেরিকার] ছবিগুলি ফেরত দিয়াছেন। তোমার কি ছবি ছিল পাই নাই তা লিখ কি ছবি ছিল। গুরুসদয়বাবুর বহির দঃ ২০০৲ টাকার মধ্যে ১০০৲ টাকা আদায় হয়েছে মাত্র আবার পত্র দেয়া হয়েছে— এখন জবাব পাই নাই। কারুসঙ্ঘের হিঃপত্র মাসোজী রেখেছেন। হিঃ বেশ পরিস্কার [পরিষ্কার] আছে।... কারুসঙ্ঘের তিন বিঘা জমি আছে, তাহার মধ্যে আর দুবিঘা বাকি আছে যে কেহ Artist কারুসঙ্ঘের মেম্বর লইবে তাহাকে দিব। কিন্তু তুমি একবার এখানে না এলে আমি কিছুই ঠিক করব না। অনেক পরামর্শ আছে। কারুসঙ্ঘ মরে নাই, আমাদের সঙ্গেই মরবে। ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না। আমি এখন ভরসা রাখি।... তুমি তো জান কারুসঙ্ঘের যা যা কাজ উঁহারাই করিবেন স্থির করিয়াছেন, তবে একটু ঢিলা পড়েছে। তবে আমি সল্‌তেটা জ্বালাইয়া রাখিয়াছি।... আর পারিনা, বয়স হয়েছে না মন অবসাদ জানি না তেমন উৎসাহ নাই।... সীবনীর কোন হিঃ পাইনা তাহারা বলে রসিদ দেখাতে। আমি তো কারুসঙ্ঘে কোন রসিদ খুঁজিয়া পাই নাই তোমার কাছে যদি থাকে তবে তুমিই একবার যেও কি হল। লোকটা সুবিধার নয়।" এরপরের পাতাগুলি হারিয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে কারুসঙ্ঘের টাকাপয়সা ঠিকমতো আদায় হচ্ছে না। সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ায় কাজে একটু ঢিলা পড়েছে। তবে এর মধ্যেও ১৯৩৪ সালেও নন্দলাল 'সল্‌তেটা জ্বালাইয়া' রেখেছেন।

আধুনিক শিল্পশিক্ষা বইয়ে বিনোদবিহারী জানান, "উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে কারুসঙ্ঘ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি।" ১৯৬৮ সালে কারুসঙ্ঘের কলকাতায় প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় লেখেন, "The Sangha ran well for some time but the plans had to be dropped for various reasons. In 1932, Sri Banerjee joined the Salt Movement and his absence told on the Sangha. Sri Manindrabhushan Gupta for some time acted as its secretary." যমুনা সেন বলেন, "আমি যা জানি তা হল, কারুসঙ্ঘ উঠে গেল লোকের

অভাবে, চালানোর অভাবে"।[২০]

ভারতশিল্পী নন্দলাল বইয়ে কারুসঙ্ঘ ভেঙে দেওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন একটি ঘটনার কথা জানতে পারি আমরা। যদিও এই তথ্য কতটা নির্ভরযোগ্য সে সম্বন্ধে অনেকেরই মনে সন্দেহ থাকতে পারে। ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে কলকাতার টাউন হলে কলাভবনের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। নন্দলাল কারুসঙ্ঘের পক্ষ থেকে কিছু কারুকর্মের কাজও প্রদর্শনীর জন্য পাঠান, কিন্তু বিশ্বভারতীর তৎকালীন কর্মসচিব এগুলিকে 'প্রাইভেট কাজ' ব'লে প্রদর্শনী থেকে বাদ দেন। নন্দলাল এতে আঘাত পান, এমন-কি কারুসঙ্ঘ 'Self-supported' হ'লে কলাভবন ছেড়ে দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেন। রবীন্দ্রনাথের কানে এই কথা পৌঁছলে তিনি নন্দলালকে ডেকে কথা বলেন ও কারুসঙ্ঘের কাজকর্ম সম্বন্ধে উৎসাহ দেন, এমন-কি কারুসঙ্ঘের জন্য জমি কিনে দেবারও প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর সেই সালেই উত্তরায়ণ থেকে তাঁকে নোটিস দিয়ে জানানো হল "extra work করতে হবে।" নন্দলাল আসল উদ্দেশ্যের কথা বুঝতে পেরে ভেঙে দিলেন কারুসঙ্ঘ— "ভেঙে দেওয়া হল আমার শিল্পী উপনিবেশের পরিকল্পনা। কারুসঙ্ঘের মৃত্যু হলো।" তাই যদি হ'ত তা হ'লে ১৯৩৪ সালে নন্দলাল কেন লেখেন, 'কারুসঙ্ঘ মরে নাই'? এই চিঠিটিকেই বিশ্বাস করার কারণ হ'ল এই যে, চিঠিটি নন্দলালের নিজের হাতে লেখা এবং ১৯৩৪ সালে লেখা, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারুসঙ্ঘের মতো জীবন্ত একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি তৎকালীন বিশ্বভারতীর আইন-সর্বস্ব আমলাদের কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল কি না সেটা আজ জানতে পারা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু আপাতত আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হ'ল কারুসঙ্ঘের স্থায়িত্বের সময়কাল নিয়ে। এই সমস্ত তথ্যাবলি থেকে আমরা দুটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি। প্রথমত, কারুসঙ্ঘ কোনো একটি বিশেষ দিন থেকে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় নি— ধীরে ধীরে কারুসঙ্ঘ, সদস্যের অভাবে, উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে শুকিয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, এই শুকিয়ে যাবার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল ১৯৩৪ সালের

পরে, আগে নয়। এ ক্ষেত্রেও বিনোদবিহারীর মন্তব্য স্মরণীয়: "কারুসঙ্ঘের পরিকল্পনা অথবা রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত শিল্পীদের গ্রাম গড়ে না উঠলেও নন্দলাল অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে কলাভবনের জীবনযাত্রাকে একটি সংঘের আদর্শে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।" [২১]

এর সঙ্গে সঙ্ঘ বন্ধ হবার আর-একটি সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। নন্দলাল চেয়েছিলেন তাঁর ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাশেষে তাঁদের শিল্পসাধনা বজায় রাখবেন। এই উদ্দেশ্যে যে-ক'জন শিল্পীকে নিয়ে তিনি এই সঙ্ঘ স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য মাইনেয় বিশ্বভারতীতে কাজ পেয়ে যান। একদিকে বিশ্বভারতী থেকে জীবিকানির্বাহের পাকা ব্যবস্থা হয়, অন্যদিকে কাছাকাছি বসবাস ক'রে একে অপরের সহযোগিতায় শিল্পচর্চাও অক্ষুণ্ণ থাকে। শান্তিনিকেতন কলাভবনে নন্দলাল শিক্ষক হিসেবে পেয়ে যান তাঁরই কৃতি ছাত্রদের। শান্তিনিকেতন আর কলাভবনের শিল্প-আদর্শ বিস্তার লাভ করে কলাভবনের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায়। এই ঘটনাবলির মধ্যে দিয়ে দেখলে মনে হয় কারুসঙ্ঘের প্রয়োজনও হয়তো ফুরিয়েছিল। কারুসঙ্ঘ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে অন্যান্য কারণের সঙ্গে এইটিও উল্লেখযোগ্য।

শিল্পীসমাজে কারুসঙ্ঘের প্রভাব

শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা সংঘবদ্ধ হলেন, কারুসঙ্ঘ শিল্পীগোষ্ঠী তৈরি হ'ল, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কারুসঙ্ঘের বিজ্ঞাপন বেরোল, সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে লেখা বেরোল, সদস্যরা স্বাধীনভাবে উপার্জন ক'রে শিল্পচর্চায় ব্যস্ত থাকলেন। সে-যুগে ভারতবর্ষের অন্যত্র এই ধরনের প্রচেষ্টা হয়তো আর কোথাও হয় নি। অথচ এমন একটি অসাধারণ কর্মকাণ্ডের কোনো প্রভাব তৎকালীন শান্তিনিকেতনের শিল্পীসমাজে কেন পড়ে নি, এ-কথা ভেবে বিস্মিত হ'তেই হয়। ছাত্রদের উপর এর প্রভাব পড়লে পরবর্তীকালে এইধরনের শিল্পী-উপনিবেশের প্রচেষ্টার নজির আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম— শান্তিনিকেতনে না-হ'লেও ভারতবর্ষের

অন্যত্র। কলাভবনের ছাত্রসমাজে কারুসঙ্ঘের প্রভাব পড়েছিল কি না জানতে চাওয়ায় শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ বলেন, "খুব বেশি পড়েছিল বলে আমার মনে হয় না, আমি অন্তত দেখি নি", "...খুব forefront-এ তার picture ছিল না।" কারুসঙ্ঘের করা কাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় বলেন, "শুনেছি সেগুলো, দেখি নি। সেগুলো দেখার কোনো scope ছিল না, কেননা তখন কারুসঙ্ঘ বলতে কোনো একটা particular ঘর ছিল না— তা যদি হ'ত তা হ'লে আমরা দেখতে পেতাম। হয়তো প্রভাতদা করছেন কি রামকিঙ্করদা করছেন, হয়তো নিজেদের ঘরে ব'সেই করছেন...।" [২২] যদিও নন্দলালের কলাভবনে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা আজও কারুশিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কারিগরদের খোঁজ করেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের করণকৌশলের শিক্ষা নেন। ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে বিনোদবিহারী এই রকম একটি পরিকল্পনা নেন— সেই অনুযায়ী রাজস্থানের জয়পুরে একটি ভাড়া-বাড়িরও ব্যবস্থা করেন তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্র শ্রীঋতেন মজুমদার। বিনোদবিহারী এইধরনের চিন্তা কোথা থেকে পেলেন জানতে চাওয়ায় শ্রীঋতেন মজুমদার বলেন, "আমার মনে হয় সেটা হয়তো কারুসঙ্ঘ থেকেই ওঁর এসে থাকতে পারে। বলতেন যে, 'তা হলে ছবি যে আমরা আঁকব— আমরা uninhibited— যে, আমাদের ছবি বিক্রি করতে হবে, ক'রে রোজগার করতে হবে সেটা না হ'লে আরও freely ছবি আঁকবে বা sculpture করবে', আর আমি তখন sculpt করতাম একটু... আমি যখন নেপালে ছিলাম বিনোদদার কাছে, তখন আমি ওঁরই উৎসাহে অনেক traditional কারিগরদের সঙ্গে কাজ করেছিলাম— একজন stone carver, wood carver— গোড়ায় ওরা traditional কাজ শেখাতো, পরে নিজের কাজ করতে দিত— master craftsman ছিল বুড়ো— metal casting শিখেছিলাম আর ওখানেই আমি কাঠের block making আর textile printing একটু একটু শিখেছিলাম"। [২৩] দেখা যাচ্ছে, কারুসঙ্ঘের শিল্পী-উপনিবেশের ধারণার বড়ো প্রভাব না থাকলেও সাধারণভাবে কারুশিল্প এবং কারিগরদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং

তাঁদের থেকে কাজ শিখে নিজেদের কাজে ব্যবহার করার ধারা মোটামুটি বজায় থেকেছে।

শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্রসমাজে কারুসঙ্ঘের খুব প্রভাব না-পড়ার পিছনে কতকগুলি নির্দিষ্ট কারণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত কারুসঙ্ঘের সদস্যরা ছিলেন তাঁরাই, যাঁরা ইতিমধ্যেই কলাভবনে শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন। যাঁরা নতুন এসে কাজ শিখতে শুরু করেছেন, তাঁদের নিজেদের কাজের ব্যস্ততার পর এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়তো কমই ছিল। দ্বিতীয়ত, কারুসঙ্ঘের কাজের তখনও কোনো নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না— কেবল প্রভাতমোহন এবং মাসোজী জমি কিনেছিলেন, তখনও সেখানে বাড়ি ক'রে বসবাস করেন না। কাজেই এঁদের কর্মকাণ্ড দেখতে পাওয়াটা খুব সহজে হয়ে উঠত না। তৃতীয়ত, কারুসঙ্ঘ খুব বেশিদিন স্থায়ী হয় নি— ফলে এইধরনের কর্মকাণ্ডের স্থায়ী প্রভাব ফেলার মতো সময়ও হয়ে ওঠে নি।

কারুসঙ্ঘ : নবপর্যায়

কলাভবনের অধ্যক্ষপদ থেকে নন্দলালের অবসর গ্রহণের পর ১৯৫১ সালে যমুনা সেন ও শ্রীননীগোপাল ঘোষের পরিচালনায় কলাভবনে ডিজাইনের দু-বছরের সার্টিফিকেট কোর্স চালু হয়। মূলত শান্তিনিকেতনের গৃহবধূরা এখানে বাটিক, সেলাই, তাঁত ইত্যাদি শেখেন। ১৯৫৮ সালের পৌষ মেলায় এখানকার ছাত্রীরা উৎসাহ ক'রে একটি দোকান করেন, যেখানে তাঁদের হাতের কাজ প্রদর্শিত হয় ও বিক্রি হয়— এমন-কি অর্ডারও আসে। যমুনা সেন বলেন, "অরুন্ধতী সেক্রেটারি ছিল তখন... তা ওরা একটা দোকান করবে ঠিক করল, জিনিস বিশেষ হ'ল না— অনেক কিছু stock নিয়ে, যাদের-যাদের stock ছিল— দিদির (গৌরী ভঞ্জ)— তাদের থেকে নিয়ে-টিয়ে একটা exhibition মতন করা হ'ল— সেই কারুসঙ্ঘ প্রথম start। তারপর ওরা বলল যে এটা আমরা চালাই। আগে এ-বাড়ি, ও-বাড়ি কোথায় হ'ত, আমার ঠিক মনে পড়ছে না—
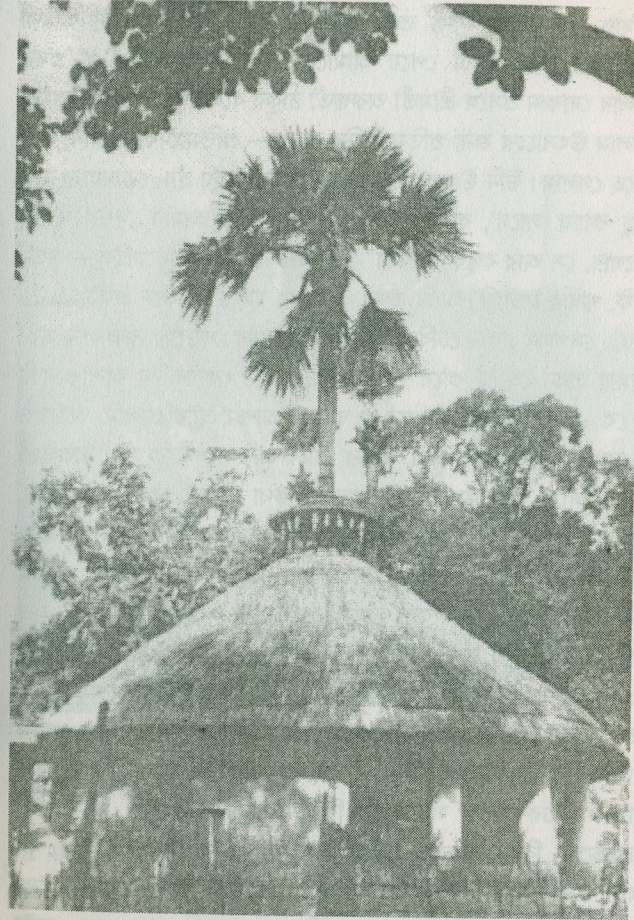
তালধ্বজ

কারুসঙ্ঘের তো একটা জায়গা আমাদের দরকার ছিল, কোথায় ঠিক হ'ত আমার মনে নেই। কিন্তু তার পরেই ওটা, ওই তালধ্বজটা আমরা পেলাম।... তালধ্বজটা পেয়ে আমাদের খুব ভালো হ'ল।"[২৪] প্রথম মেলার দোকান প্রসঙ্গে শ্রীমতী অরুন্ধতী ঠাকুর বলেন, "...তারপর আমরা গেলাম উৎসাহের জন্য প্রতিমাপিসির কাছে— প্রতিমাদেবী ছিলেন, তাঁর কাছে গেলাম। উনি উৎসাহ দিলেন— বললেন 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের যদি কিছু কাজে লাগে', বলে কিছু টাকাও দিলেন... আমার দেওর বাদশা টেগোর, সে আর বন্ধুরা 'বলাকা' ব'লে একটা দোকান দিয়েছিল— মানে কফি, খাবার ইত্যাদি। আমি তখন ধ'রে বসলাম যে এখানে একটা space দাও... সেখানে একটা টেবিল দিয়ে আমরা তখন সেগুলো সাজালাম সব। আমরা তখন হৈ-হৈ ক'রে এসব করছি। কেউ কোনোদিন আশাও করি নি যে এর থেকে কিছু দাঁড়াবে।... আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম, অর্ডারও পাওয়া গেল... বিক্রিও হ'ল, আমরা গিয়ে প্রতিমাদেবীকে তাঁর টাকাটাও ফেরত দিতে পারলাম।"[২৫] নিয়মাবলির কথা জানতে চাওয়ায় বললেন, একটা কমিশন কাটা হ'ত electric bill, দারোয়ানের খরচ ইত্যাদির জন্য, তবে সব থেকে জোর দিলেন ডিজাইন ও কাজের মানের উপর, "নিয়ম ছিল একটা standard থাকবে ডিজাইনের। যমুনাদি থাকবেন control-এ আর ex-কলাভবন হতে হবে, actually আমরা যখন শুরু করলাম, ex-craft (সার্টিফিকেট কোর্সের প্রাক্তন ছাত্রীরা) দিয়েই শুরু হ'ল।" "যমুনাদিকে তো ছাড়াই হবে না... যমুনাদিকে ছাড়া হয় নি, বরাবর আছেন, এখনও আছেন।" আগেকার কারুসঙ্ঘ বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন কি না, এই কারুসঙ্ঘ শুরু করার সময় ওই শিল্পী-উপনিবেশ ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন কি না জানতে চেয়েছিলাম, যমুনা সেন বললেন, "না, খুব বেশি ওয়াকিবহাল ছিলাম না।" শ্রীমতী অরুন্ধতী ঠাকুর বললেন, "না, আমাদের তখন কোনো এসব idea ছিল না। তখন যে ওরকম একটা বড়ো হবে বা কিছু হবে, সেটাই মাথায় ছিল না।" যমুনা সেন ছাড়া তখন সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শ্রীমতী অরুন্ধতী ঠাকুর, শ্রীমতী ছবি সান্যাল

নতুন কারুসঙ্ঘে তৈরি চাদর গায়ে নন্দলাল

১৯৩০ ১৯৬৮
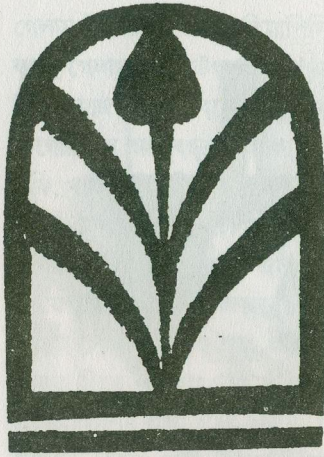
কারুসঙ্ঘের সীল

(চক্রবর্তী), শ্রীমতী উষা লাল, শ্রীমতী গৌরী ঘোষ, শ্রীমতী মীনা মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য। ১৯৬৮ সালে কলকাতায় কারুসঙ্ঘের প্রদর্শনী উপলক্ষে যে-পুস্তিকা প্রকাশিত হয় তাতে বিনোদবিহারী লেখেন, "Years later, in 1961, the Sangha was revived by some women workers under the leadership of Sm. Jamuna Sen." কারুসঙ্ঘের বিশেষত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "A speciality that the Sangha enjoys is that it remains business-like, but has not been commercialized." ১৯৩০ সালের কারুসঙ্ঘ বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। সেই কারুসঙ্ঘের কাজ বন্ধ হবার অনেক বছর পর, একসঙ্গে অনেক ভালো ভালো হাতের কাজ করার আনন্দে-উৎসাহে-উত্তেজনায়, মেলার দোকানের মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল নতুন কারুসঙ্ঘ। এই কারুসঙ্ঘ প্রথম কারুসঙ্ঘের আদর্শ ও পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল ছিল না। আজও তালধ্বজ-প্রাঙ্গণ বিভিন্ন বয়সী মহিলাদের সৃষ্টিশীল কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে জীবন্ত থাকে।

পরিবর্তন হ'ল না নামের— নাম রইল 'কারুসঙ্ঘ'। শিল্পীদের উপনিবেশ রূপান্তরিত হ'ল "Women Artists' Association, Santiniketan"-এ। আর এই রূপান্তরের চিহ্ন র'য়ে গেল নন্দলালের তৈরি সীলের নক্‌শার সামান্য পরিবর্তনে।

উল্লেখপঞ্জি

১ নন্দলাল বসু, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি (জুন ১৯৩৯)। সংগ্রহ : রবীন্দ্রভবন।

২ প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, "নন্দলাল : কারুসঙ্ঘ ও জাতীয় আন্দোলন", *দেশ*, বিনোদন সংখ্যা (কলিকাতা : ১৩৮৯)।

৩ প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিনোদবাবু', *Visva-Bharati News*, Binodebehari-Smarana (March-April 1981)।

৪ নন্দলাল বসু, "শিক্ষায় শিল্পের স্থান", *দৃষ্টি ও সৃষ্টি* (কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৯২) পৃ. ১০-১১ দ্রষ্টব্য।

৫ যমুনা সেন, টেপ্‌ রেকর্ডারে গৃহীত সাক্ষাৎকার (শান্তিনিকেতন : ১০ মে ১৯৯৫)।

৬ প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশ*, প্রাগুক্ত।
Benodebehari Mukherjee, 'Karu Sangha', *Karu Sangha : Exhibition of Arts and Crafts* (Calcutta : 1968).
পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, খণ্ড ২ (রাঢ় গবেষণা পর্ষদ প্রকাশন ১৩৯০), পৃ. ৫৬৮।
৭ প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশ*, প্রাগুক্ত।
৮ Benodebehari Mukherjee, *Karu Sangha* , প্রাগুক্ত।
৯ প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশ*, প্রাগুক্ত।
১০ ইন্দুসুধা ঘোষ, 'পুণ্যস্মৃতি', *Visva-Bharati News*, Nandalal-Smarana (March-April 1987)।
১১ নন্দলাল বসু, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি (১৯৩৪?)। সংগ্রহ : রবীন্দ্রভবন।
১২ শিশিরকুমার ঘোষ, টেপ্ রেকর্ডারে গৃহীত সাক্ষাৎকার (শ্রীনিকেতন : ৮ মে ১৯৯৫)।
১৩ যমুনা সেন, প্রাগুক্ত।
১৪ Benodebehari Mukherjee, *Karu Sangha,* প্রাগুক্ত।
১৫ পঞ্চানন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৪।
১৬ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *আধুনিক শিল্পশিক্ষা* (কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৭৯), পৃ. ৭৯।
১৭ সুধীর খাস্তগীর, *আমার এ পথ* (কলকাতা : চাক্ষুষ ১৯৯৪), পৃ. ৮।
১৮ প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশ*, প্রাগুক্ত।
১৯ তদেব।
২০ যমুনা সেন, প্রাগুক্ত।
২১ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, *আধুনিক শিল্পশিক্ষা* (কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৩৭৯), পৃ. ৭৯।
২২ শিশিরকুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত।
২৩ ঋতেন মজুমদার, টেপ্ রেকর্ডারে গৃহীত সাক্ষাৎকার (শান্তিনিকেতন : ২৫ মে ১৯৯৫)।
২৪ যমুনা সেন, প্রাগুক্ত।
২৫ অরুন্ধতী ঠাকুর, টেপ্ রেকর্ডারে গৃহীত সাক্ষাৎকার (শান্তিনিকেতন : ১৩ মে ১৯৯৫)।

কারুসঙ্ঘ : বিশ্বাস ও ভাবনা-প্রবাহের সন্ধানে

যন্ত্রসভ্যতার যুগে মূল্যবৃদ্ধি ও নতুন শোষণ-নীতির মধ্যে দিয়ে দুটি আন্দোলন জেগে ওঠে— ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও সমবায় আন্দোলন। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ১৮৬০-এর দশক থেকে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছিল সমবায় আন্দোলন। ১৮৭০-এর দশকে Deccan Draught নামে পরিচিত দুর্ভিক্ষ দক্ষিণ ভারতের চাষীদের বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ইয়োরোপের সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে ইয়োরোপ থেকে তথ্য ও জ্ঞান সঞ্চয় করে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির তৎকালীন ব্রিটিশ অফিসার ১৯০১-০২ সালে সেখানকার চাষীদের সংঘবদ্ধ করেন। ১৯০৪ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ভারতবর্ষের প্রথম সমবায় আইন গৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার শ্রীধরপুরে ১৯১২ সালের আগে প্রতিষ্ঠিত চাষীদের একটি আনলিমিটেড সমবায় সমিতি আজও সক্রিয় আছে।

রবীন্দ্রনাথ সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এ কথা আমরা জানি। তিনি মনে করতেন মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনেই মানুষের মঙ্গল। "চরকা" প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, "...মানুষ যখন মানুষ তখন তার জীবিকাও কেবল শক্তিসাধনার ক্ষেত্র না হয়ে মনুষ্যত্বসাধনার ক্ষেত্র হয়, এইটেই উচিত ছিল। জীবিকার ক্ষেত্রেও মানুষ কেবল আপন অন্ন পাবে তা নয়, আপন সত্য পাবে, এই তো চাই। কয়েক বছর পূর্বে যেদিন সমবায়মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি, আমার মনে জটিল সমস্যার একটা গাঁঠ যেন অনেকটা খুলে গেল। মনে হ'ল, যে জীবিকার ক্ষেত্রে স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য মানুষের সত্যকে এতদিন অবজ্ঞা ক'রে এসেছিল, সেখানে স্বার্থের সম্মিলন সত্যকে আজ প্রমাণ করবার ভার নিয়েছে। এই কথাই বোঝাতে বসেছে যে, দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে, ধন তার সম্মিলনে। সকল দিকেই মানবসভ্যতার এইটেই গোড়াকার সত্য— মনুষ্যলোকে এ সত্যের কোথাও সীমা থাকতে পারে, এ আমি বিশ্বাস

করিনে।" [১] মানুষের অসম্মিলন যে দারিদ্র্য তৈরি করেছে, সেই অর্থ ও মনুষ্যত্বের দারিদ্র্য দূর করবার কাজে রবীন্দ্রনাথ সমবায়নীতি নিয়ে শুধু ভেবেছেন বা আলোচনা করেছেন এমন নয়, নিজের জমিদারিতে এবং বিশ্বভারতীতে এই নীতি সার্থকভাবে প্রয়োগও করেছেন। 'স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য' ধনী-গরীবের বিভাজন তৈরি করে আর 'মানুষের সত্য'কে অবজ্ঞা করে ব'লেই সেই সমাজের সাংস্কৃতিক উৎপাদন হয়ে ওঠে অসত্যের প্রচার। তাই মানুষের অসম্মিলনে নয়, তার সম্মিলনের মধ্যে দিয়ে যাঁরা স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করেন— 'মানুষের সত্যে'র উপলব্ধি ছায়া ফেলে তাঁদের সংস্কৃতি চর্চায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে আমরা এর পরিচয় পাই।

বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে ৩ ভাদ্র ১৩১০ [১৯০৩] সালে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "হাজারিবাগের কাজ যদি তুমি পাও আমার জন্য বড়াকর [বরাকর] নদীতীরে শালবন বেষ্টিত একটি বৃহৎ ভূখণ্ড সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ একটি জমি আছে— নিবারণবাবু ও গিরীন্দ্রবাবু তাহা আমার জন্য যোগাড় করিবেন আশা দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের নীরবতা ও নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া সন্দিহান হইয়াছি। ১০০-২০০ বিঘা জমি যদি পাই তবে আমি সেখানে আমাদের একটি বন্ধুপল্লী বসাইব। তাহা আমাদের তপোবন হইবে। তোমারও একটা কুটীর তাহার মধ্যে থাকিবে। সকলে মিলিয়া চাষবাস করিয়া গরুবাছুর রাখিয়া বিশ্রব্ধ আলাপে এবং ভাবের চর্চায় সুখে থাকিব। যদি এইরূপ ভালো জায়গা অল্প নিরিখে নির্জন স্থানে তোমার জানা থাকে তবে নিশ্চয় আমার কথা স্মরণ করিয়ো— আমি এইরূপ আশ্রমের জন্য ব্যাকুল হইয়া আছি।" [২] শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পরেও তা হলে রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল হয়েছিলেন এমন একটি আশ্রমের জন্য। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি শ্রীশচন্দ্র ও তাঁর খুল্লতাত ভ্রাতা সুবোধচন্দ্রকে জমির ব্যাপারে চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্রের পুত্র সন্তোষচন্দ্র ১৯০৬ সালে আমেরিকা যান কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করতে। তাঁরা ফিরে এসে

যাতে স্বাধীন ভাবে চাষবাস করতে পারেন, সেইজন্যও জমির প্রয়োজন ছিল। ১৯০৩ সালে লিখছেন, "জমির সন্ধান কোরো। ভবিষ্যতে বিশেষ কাজে লাগবে। সন্তোষ ও রথীকে agriculture-এর জন্যই তৈরি করব স্থির করেছি— ওরা দুইজনে মিলে চাষবাস করবে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করে জীবন কাটাবে।... তুমি এইটেতে একটু মনোযোগ দিও।" [৩]

১৩১৪ [১৯০৭] সালের চিঠি, "মাদরামোর জমি সম্বন্ধে সকল কথা আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে যদি পাওয়া যায় তবে জমি নিতে দ্বিধা করবার হেতু নেই। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে পাওয়া যাবে কি— যদি যায় ত কত পরিমাণ জমি? ভালোরূপ তদন্ত করে জানিও— এবং যাতে হস্তগত হয় তার জন্য একটু চেষ্টাও রেখো— বরাবর দগ্ধভাগ্যের যে রকম পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে আশা করতে সাহস হয় না।" [৪]

২২ আশ্বিন, ১৩১৪ [১৯০৭] সালে লেখা, " 'গুমো'র কোনো আশা আছে কি?... সেখানে আমরা চাষের জমি চাইনে— বাসের জমি চাই।" [৫] ১৪ অক্টোবর, ১৯০৭ সালে, "গুমো এবং সরাইয়ার কথা স্মরণে রেখো। চাষ এবং বাস দুই জমাতে পারলে ভালো তবে কিনা সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" [৬]

২ মাঘ ১৩১৪ [১৯০৮] সালের চিঠিতে, "গুমোর বাসের জমি অন্তত বিঘা দশ পনেরো একটু রমণীয় জায়গায় পাওয়া যায় কিনা খবর নিয়ো। সেই সঙ্গে চাষের জমি ১০০০ বিঘা না হোক ২০০-৩০০ বিঘার চেষ্টা দেখা যাক— একটু উর্ব্বরা [উর্ব্বরা] দেখে জমি বেছে নেওয়া চাই।" [৭]

'ভাবের চর্চা', 'বিশ্রব্ধ আলাপ', 'চাষবাস', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা' ইত্যাদি কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে সুখে থাকতে পারার এক গোষ্ঠী বা 'বন্ধুপল্লী'র পরিকল্পনা প্রায় পাঁচ বছর ধ'রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনে লালন করেছেন। যদিও এমন আশ্রম কখনো তৈরি হয় নি।

শিলাইদহে পদ্মার বোটে নন্দলাল ও মুকুল দে

১৯১৬ সালে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা' সভা প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য, নাটক, সংগীত, শিল্পকলা ইত্যাদি চর্চার এই বিশেষ সভাটির মধ্যেও প্রবাহিত ছিল সেই সম্মিলনের দর্শন। একসঙ্গে বসবাস ক'রে, আলোচনা ও শিক্ষার মধ্যে দিয়ে 'মানুষের সত্য' সন্ধান ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যুগোপযোগী সংস্কৃতি চর্চা এই ছিল 'বিচিত্রা' সভার মূল উদ্দেশ্য। রাশিয়া ভ্রমণের পর ৫ অক্টোবর, ১৯৩০ সালে নন্দলালকে লিখিত পত্রেও রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিল্প সংরক্ষণ ও শিল্পচর্চার কথা উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবনে সকল সৃষ্টিই মানুষের সঙ্গে মিলবার তপস্যার ফল। শিলাইদহ, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, বিশ্বভারতী, বিভিন্ন উৎসব-মেলা-উপাসনা ইত্যাদি এই তপস্যার পরিচয় বহন করে।

১৯০৯ সালে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নন্দলালের প্রথম দেখা হয়। সেই সময় থেকেই ধীরে ধীরে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাবনা বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে নন্দলালের জীবনে। ১৯১৪ সালের ১ মে রবীন্দ্রনাথ, নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে আনুষ্ঠানিক ভাবে অভ্যর্থনা জানান। ১৯১৫-১৬ সালের শীতকালে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে মুকুল দে ও সুরেন করের সঙ্গে নন্দলাল শিলাইদহে পদ্মার বোটে ছবি এঁকে সময় কাটান মাস খানেক। এই ভ্রমণ এবং রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য নন্দলালের শিল্প-ভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে।

শিলাইদহ থেকে ফিরে আসার পর নন্দলাল ও তাঁর বন্ধুরা তাঁর হাতিবাগানের বাড়িতে ব'সে ঠিক করলেন যে, সবাই মিলে একসঙ্গে থেকে ছবি এঁকে উপার্জন করবেন। তৎকালীন সমাজে শিল্পীরা যেভাবে উপার্জন করতেন, তাকে অস্বীকার ক'রে সম্মিলিতভাবে স্বনির্ভর হবার চিন্তা থেকেই এইভাবে জীবনযাপন করার পরিকল্পনা জাগ্রত হয়েছিল নিশ্চয়ই। নন্দলালের কথায়, "একসঙ্গে রান্না বাড়া হবে। খাবো, থাকবো, ছবি আঁকবো। ছবি বিক্রি করবো, বুক-ইলাস্ট্রেট করবো— এইসব আমাদের আইডিয়া তখনকার।" [৮]

'বিচিত্রা' সভা প্রতিষ্ঠিত হবার আগে নিজের গ্রামের বাড়িতে কালীঘাট পটের ধরনে বিভিন্ন প্রবাদ-প্রবচন নিয়ে ছবি করতেন নন্দলাল। সেই ছবিগুলি এক মুদির দোকানে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতেন বিক্রির জন্য। বিক্রির অর্থ থেকে কিছু রেখে বাকিটা দোকানী দিতেন নন্দলালকে। এর থেকে মাসে প্রায় পনেরো-কুড়ি টাকা রোজগার হ'ত। একে নন্দলাল 'শিল্পখেলা' বলেছেন। বিশেষ কারণে এই খেলা বেশিদিন চলে নি। অনেক পরে ১৯৪১ সাল নাগাদ আবার সস্তায় ছবি বিক্রি করার চেষ্টা করেন। লোকে বলত মধ্যবিত্তরা বা যাঁরা ছবি ভালোবাসেন তাঁরা অত পয়সা দিয়ে ছবি কিনতে পারেন না। এই কথা ভেবে তিনি পাঁচটি ছবি আঁকলেন মধ্যবিত্ত শিল্প-রসিকদের জন্য, আর প্রত্যেকটির দাম রাখলেন তিরিশ টাকা করে। ছবিগুলি কিনে নিলেন ও. সি. গাঙ্গুলী ও চেট্টি মুদালিয়র। আর যে ছবিটি পড়ে ছিল, তার দাম শুনে চটে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ নিজে সেটি কিনে নিলেন ২০০ টাকা দিয়ে। এই ঘটনা সম্পর্কে নন্দলাল বলেন, "মধ্যবিত্তের উপকার করতে গিয়ে, কেবল ঠক্‌লো আর্টিস্ট। লাখপতির ঘর থেকে সে ছবিগুলো আবার চলে যাবে কোটিপতির ঘরে ; এই ঠকা হল কেবল মিড্‌লম্যানের জন্য। দুনিয়ার অর্থনীতির কাঠামো না বদলালে আমাদের এই এক্‌স্‌পেরিমেন্ট্‌ অর্থহীন। সুতরাং ও পথ ত্যাগ করলুম।" [৯] সারা জীবন ধ'রে, শিল্পকে সহজলভ্য ক'রে তোলার তপস্যার পথ যে নন্দলাল কখনোই ত্যাগ করেন নি, তা তাঁর জীবনই প্রমাণ করে। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যেও, বার বার ঠকেও নতুন পথের সন্ধান করেছেন, নিজের শিল্পকর্মের মধ্যে দিয়ে সবার সঙ্গে যুক্ত হবার।

এরপর ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হল 'বিচিত্রা' সভা। বন্ধুদের সঙ্গে ষাট টাকা বৃত্তিতে নন্দলাল সভ্য হলেন, শিল্পশিক্ষক হলেন 'বিচিত্রা' সভার। এই সভার বিচিত্র কর্মকাণ্ড ভারতবর্ষের শিল্প-সাহিত্যের জগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমরা কারুসঙ্ঘের আলোচনা প্রসঙ্গে শুধু একটি বিশেষ দিকের উল্লেখ করব। এই সময় বাংলার কুটিরশিল্পের প্রতি আগ্রহ দেখা দেয় এবং লোকশিল্পের একটি সংগ্রহালয়ও গ'ড়ে ওঠে।

ব্রতকথা ও তৎসংলগ্ন আল্‌পনার বিষয়ে লেখা অবনীন্দ্রনাথের বই *বাংলার ব্রত* প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' সভার উদ্‌যোগে।

রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল দু-জনেই কারুশিল্প, কুটিরশিল্প ইত্যাদি ব্যবহারিক শিল্পের বিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহিত ছিলেন। গ্রামীণ শিল্পের নান্দনিক উপাদানের গুরুত্ব এঁরা সব সময় অনুভব করেছেন— এবং লোকশিল্প-সাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন বিশ্বভারতীতে। শিল্পের ব্যবহারিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা সম্বন্ধেও দুজনেই ছিলেন সচেতন। ১ পৌষ, ১৩২২ [১৯১৫] ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "চাটগাঁ অঞ্চলে 'মেয়েলি শিল্প' যা কিছু প্রচলিত আছে সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? ওরা লক্ষ্মীপূজা, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে যে-সমস্ত আল্‌পনা এঁকে থাকে সেগুলি কোনো শিল্পপটু মেয়েকে দিয়ে কাগজের উপর আলতার রঙে আঁকিয়ে পাঠাতে পারেন? খাঁটি সেকেলে জিনিষ হওয়া চাই। শিকে, কাঁথা প্রভৃতি গৃহস্থালীর শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করতে চাই। আর একটি জিনিষ চাই— চাটগাঁ অঞ্চলে যত বিভিন্ন রীতির কুঁড়ে ঘর আছে, তার ফোটো বা অন্য কোনো রকমের প্রতিকৃতি।... ওখানে জনসাধারণের মধ্যে মাটির, কড়ির, বাঁশের বা বেতের শিল্পকাজ কী রকম চলিত আছে, ভালো করে খোঁজ নেবেন। আমরা বাংলার প্রত্যেক জেলা থেকে এই সমস্ত গণশিল্প সংগ্রহ করতে ব্রতী।" [১০] রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ শিল্পবোধ সম্পর্কে কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং কত খুঁটিনাটি বিষয়ে অবহিত ছিলেন, এই চিঠি থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরো অনেকের কাছেই রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্রে এই আগ্রহ দেখিয়েছেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর একসময় রবীন্দ্রনাথের উৎসাহেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কুটিরশিল্প ও দৈনন্দিন ব্যবহার সামগ্রী সংগ্রহে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত নথিপত্রে।

রবীন্দ্রনাথ যাকে 'গণশিল্প' বলেছেন, সেই সকলের জন্য শিল্পের চর্চা নন্দলাল হাতে কলমে করেছেন এই শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে

আঁদ্রে কার্পেলেস্

ভিত্তিচিত্র ও Environmental Sculpture-এর প্রাধান্য, কালোবাড়ি, শ্যামলী, চৈত্য ইত্যাদি শিল্পকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে নন্দলাল, তাঁর সহকর্মীরা ও ছাত্রছাত্রীরা বার বার শিল্পকে, সৌন্দর্য-চর্চাকে সকলের সামগ্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর এই কাজে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন পরম্পরাগত কারিগরদের কাছ থেকে।

কলাভবন প্রতিষ্ঠার চার বছর পর প্রতিমাদেবী ও ফরাসি শিল্পী আঁদ্রে কার্পেলেসের নেতৃত্বে কলাভবনে 'বিচিত্রা' নাম দিয়ে ব্যবহারিক ও কারুশিল্পের একটি বিভাগের প্রচলন করা হয়। এই 'বিচিত্রা' ই স্থানান্তরিত ও নামান্তরিত হয়ে 'শিল্পসদনে'র মধ্যে পরিণতি লাভ করেছে। *শান্তিনিকেতন* পত্রিকায় (১৩২৯ চৈত্র [১৯২৩]) আঁদ্রে কার্পেলেস্ 'বিচিত্রা'র 'practical aim' সম্বন্ধে লিখছেন,

> "—To establish permanent co-operation between the artists and the craftsmen.
> "—To prevent as far as possible that harmful separation between art and crafts which is quite contrary to the Indian spirit and deprives art of all decorative qualities.
> "—To keep up that love of beauty in the simplest objects of daily use which was so characteristic of Indian life and which provided the artists and craftsmen with such a wide field of creative expression."

রবীন্দ্রনাথ যাকে 'গণশিল্প' বলেছেন, সেই ভারতীয় 'গণশিল্প' সম্বন্ধে আঁদ্রের মতামত হ'ল,

> "No country in the world has had such a rich past in the field of Popular Art as India, and she must not be deprived of one of her most precious treasures. In no other country have the simplest people understood so clearly that 'a thing of beauty is a joy for ever'."

'গণশিল্পে'র আর্থিক প্রতিষ্ঠার দিক সম্বন্ধেও তাঁরা সচেতন ছিলেন,

> "...we have plenty of ideas, and we find amongst the artists of Kala-Bhavana great help and plenty of good will— but we want outsiders to encourage us, we need ORDERS to keep our place going."

শান্তিনিকেতনের আশপাশের গ্রামের শিল্পীদের এই 'বিচিত্রা'য় এনে তাঁদের কাছ থেকে কাজ শেখা হ'ত, তাঁদের কাজ শেখানো হ'ত এবং এইসব লোকশিল্পীদের সংগঠিত ক'রে, তাঁদের কাজের জন্য অর্ডার সংগ্রহ ক'রে তাঁদের স্বনির্ভর ক'রে তোলা হ'ত।

'বিচিত্রা'র সমসময়ে অবনীন্দ্রনাথ 'কারুছত্র' নাম দিয়ে এক সভার পরিকল্পনা শিল্পী-সমাজে উপস্থিত করেন। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়েন্টাল আর্ট থেকে প্রকাশিত বীরেশ্বর সেন -সম্পাদিত *অয়ন* পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩৩০ [১৯২৩] সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথ 'কারুছত্র' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। "কাব্যকলা, শিল্পকলা, নাট্য, নৃত্য" ইত্যাদি বিদ্যাকে একত্র করার প্রয়াস ছিল এর মধ্যে। এমন একটি গোষ্ঠীর পরিকল্পনা তাঁর মাথায় ছিল যেখানে সমমনস্ক শিল্পীরা একত্র হবেন, চর্চা করবেন আর রক্ষা করবেন শিল্পসাহিত্যকে। সম্মিলনের পথেই এর সার্থকতা— এই উপলব্ধি থেকেই লিখছেন, "সকল দেশেই রসিক ও শিল্পপন্থীরা সময়ে সময়ে কারুছত্র বিদ্বৎগোষ্ঠী— এমনই নানা রকম আয়োজনের মধ্যে দিয়ে একত্র হবার চেষ্টা করেছে এবং এই উপায়ে জনকতকের কাজের একতা ভাবের একতা দিয়ে ক্রমে মানুষ ভিতরে-বাইরে বড় রকমের একতা লাভ করেছে।" সমবায়-নীতির সত্যতাও স্বীকৃত হয়েছে তাঁর লেখায়, "এই সব ছত্রের একটা গুণ দেখি— সেখানে সামাজিক উচ্চনীচ ভেদ মানুষে-মানুষে থাকে না, মান সেখানে কর্মের ও বুদ্ধির— জন্মগত বা ধনগত নয়, কাজের যথার্থ সম্মান দিয়েই এই সব ছোট-ছোট ছত্র অটুট বল সঞ্চয় করেছে।"

পূর্ববর্তী আলোচনার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও আঁদ্রে কার্পেলেসের সংস্কৃতি-ভাবনায় একটি ছন্দের মিল আমরা লক্ষ করি। এঁরা একে অপরকে প্রভাবিত করেছেন, সহযোগিতা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। যে ক'টি সভা অথবা গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হ'ল, তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অনেক গুণী মানুষ— সকলে মিলে সেই সময় জুড়ে সংস্কৃতিচর্চার একটি আদর্শ ভিত্তি ও পরিবেশ গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা

করেছেন। একটি বিশেষ জীবনবোধ থেকে উঠে আসা বিশেষ জীবনযাপনের পরিকল্পনার যে স্রোতের উল্লেখ আমরা ইতিমধ্যে করেছি, তারই একটি ঢেউ হ'ল বেশিদিন-স্থায়ী-না-হওয়া 'কারুসঙ্ঘ'।

উল্লেখপঞ্জি

১ *সবুজপত্র*, ১৩৩২ ভাদ্র ; *কালান্তর*, পরিশিষ্ট : 'সমবায়নীতি'।
২ *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, ১৩৫৮ শ্রাবণ-আশ্বিন।
৩ তদেব, ১৩৭৩ শ্রাবণ-আশ্বিন।
৪ তদেব, ১৩৭৩ মাঘ-চৈত্র।
৫ তদেব, ১৩৭৪ বৈশাখ-আষাঢ়।
৬ তদেব।
৭ তদেব।
৮ পঞ্চানন মণ্ডল, *ভারতশিল্পী নন্দলাল*, খণ্ড ১ (শান্তিনিকেতন : রাঢ় গবেষণা পর্ষদ প্রকাশন ১৩৮৯), পৃ. ৩৯৯।
৯ তদেব, পৃ. ৬৯৭।
১০ *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, ১৩৬৩ কার্তিক-পৌষ।

কারুসঙ্ঘ : তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ধীরে-ধীরে দেশ ও কাল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে শুরু করে। ব্রিটিশ শাসকরা ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির মাহাত্ম্য প্রচারে ব্যস্ত হলেন। ইংল্যান্ড থেকে দ্বিতীয় স্তরের শিল্পীরা এলেন ভারতবর্ষে, আঁকলেন ভারতীয় প্রকৃতি, মানুষ, ঘটনাবলির ছবি, যা দেশে পাঠিয়ে বিক্রি করার ব্যবস্থা হ'ল। এদের কাছ থেকেই আমাদের দেশের শিল্পীরা তালিম নিলেন ছবি আঁকার। ইয়োরোপীয় চোখে নিজের দেশকে দেখতে শিখলাম আমরা, এমন এক রুচির চর্চা করলাম আমরা যা কেবল ইয়োরোপীয় মনের চাহিদা মেটায়। এমন এক রুচি যা বিক্রি হয়। অন্যদিকে ভারতবর্ষের কারুশিল্পকে ধ্বংস করারও আয়োজন হ'ল। ভারতীয় শিল্পীদের সভ্য করতে ও ব্রিটিশ সার্ভেয়র, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদিদের সাহায্য করবার জন্য উপযুক্ত দক্ষ ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান তৈরির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ল আর্ট কলেজগুলি। যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই দেশে এসেছিল শুধুমাত্র লুণ্ঠন করতে, তাদের পক্ষে এইটেই ছিল স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষের শিল্পীরা আর্ট কলেজের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যখন ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির 'আলো'য় আচ্ছন্ন, সেই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে, দেশ ও কালের সঙ্গে গভীর মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে বিকল্প সংস্কৃতি চর্চায় সংঘবদ্ধ হলেন একদল শিল্পী। 'বিচিত্রা'সভা, কারুছত্র, কলাভবন, 'বিচিত্রা', শ্রীনিকেতন, কারুসঙ্ঘ— সবই এই বিশেষ কারণে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সেই যুগে এই শিল্পীরা যদি সংঘবদ্ধ না-হতেন, স্বনির্ভর না-হতেন, একটি বিকল্প শিল্পচর্চার পরিবেশ গঠন না-করতেন, তা হ'লে ভারতীয় আধুনিক শিল্প আজ আরো অনেক পিছনে প'ড়ে থাকত। সমাজ ও সময়ের এই ছিল দাবি— এঁরা সেই দায়িত্ব পালন করেছেন।

একদিকে, যে-কোনো সমাজে সকল সাংস্কৃতিক কর্মীই যেহেতু

শাসকশ্রেণীর উপর অর্থনৈতিক ভাবে নির্ভরশীল— সেহেতু, কেবলমাত্র জীবনযাপনের জন্যই শিল্পচর্চাও হয়ে ওঠে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ ও রুচি প্রচারের যন্ত্র। সমবায় নীতির ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ ও স্বনির্ভর হয়ে স্বাধীন ভাবে কাজ করার পথই এই পরিস্থিতিতে একমাত্র বিকল্প। অন্যদিকে, দেশীয় ভৌগোলিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে যে রুচি ও সৌন্দর্যবোধ প্রতিষ্ঠিত ছিল, কারুশিল্প ও চারুশিল্পের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ক'রে, সেই বোধকে ফিরিয়ে এনে, সময়োপযোগী শিল্পচর্চার প্রয়োজন ছিল। ইয়োরোপ থেকে আমদানি করা রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি কৃত্রিমভাবে এই স্থান অধিকার করছিল। এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সেই যুগে কারুসঙ্ঘের পরিকল্পনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক, এমন-কি বৈপ্লবিক।

ব্রিটিশ শাসকরা বিদায় নিয়েছেন বহুদিন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর কেটে গেছে অনেক বছর। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশও বদলে গেছে। আজকের পরিবেশেও শিল্পীগ্রামের পরিকল্পনার কোনো তাৎপর্য বা প্রাসঙ্গিকতা আছে কি না, সেই ভাবনায় যাওয়ার আগে চেষ্টা করব আজকের ভারতবর্ষকে বুঝে নিতে। ব্রিটিশ শাসকরা বিদায় নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু আজও তাঁদের প্রতি আনুগত্য আমরা বহু নিষ্ঠায় বজায় রাখি। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা (অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকদের সমাবর্তনের পোশাকসহ), বিচার-ব্যবস্থা, পুলিশ-ব্যবস্থা, স্বাধীন ভারতের সংবিধান, কপিরাইট আইন— এ-সবেই এই আনুগত্যের প্রকাশ লক্ষণীয়। ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁদের কৌশল স্বাভাবিক নিয়মে বদল করেছেন। অন্য দেশ চালানোর দায়িত্ব তাঁরা আর নেন না— তার দায়িত্ব থাকে স্বদেশীদেরই উপর। তাঁরা শুধুই বাজার চান, ক্রেতা চান। ক্রেতাও তৈরি করতে হয়, মানুষের চাহিদাও তৈরি করতে হয়। ধনতন্ত্রের বিভিন্ন স্তর পার হয়ে আজ এই উত্তর-আধুনিক যুগে এতদিন অবধি দখল না-হওয়া, মানুষের অচেতন মন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে তৈরি হচ্ছে ক্রেতা, তৈরি হচ্ছে চাহিদা। বিজ্ঞাপন-শিল্প ও প্রচার ব্যাবসা (Media & Advertising Industry)

আনাগোনা করে মানুষের সেই মনের মধ্যে। একসময় কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি আর মানুষের সঙ্গে একাত্ম হবার প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছিল সৌন্দর্যের বোধ— সেই রুচিবোধ দিয়ে তৈরি হ'ত মানুষের বাড়ি আর তাকে সাজানোর শিল্প, সেই সৌন্দর্যবোধ দিয়ে তৈরি হ'ত গয়না, পোশাক ইত্যাদি, মানুষের মুখের ভাষা সুন্দর করেছিল এই বোধ। আজও যে-কোনো দেশের 'গণশিল্প' এই বোধেরই শিক্ষা দেয়। সমস্ত লোকশিল্পের মধ্যেই এই রুচিবোধ ঘোরাফেরা করে। আজ এই রুচিবোধের স্থান অধিকার করেছে বিজ্ঞাপন-শিল্প।

অন্যদিকে, শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্রের সংখ্যা সেদিনের তুলনায় আজ অনেক বেড়েছে। শিক্ষিত শিল্পীর সংখ্যাও তুলনায় অনেক বেশি। সরকারি অথবা বেসরকারি চাকরি সেই তুলনায় সকলকে কাজ দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অনেকেই শুধু ছবি এঁকে জীবিকা উপার্জনের পক্ষপাতী। ছবি যে পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে, ছবি এঁকে, বিক্রি ক'রে যে প্রচুর উদ্‌বৃত্ত উপার্জনের সম্ভাবনা আছে— সেই পথের দিকে তাকিয়েই হয়তো আজ শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্রগুলিতে আবেদনকারীর সংখ্যা অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবেই শিল্পচর্চা হয়ে উঠেছে বাজার-কেন্দ্রিক। এমন-কি প্রায় কিনতে-পারা-অসম্ভব Installation Art-ও সংগৃহীত ও প্রদর্শিত হতে শুরু করেছে। এই হ'ল সাধারণভাবে আজকের শিল্পশিক্ষা ও শিল্পচর্চার পরিবেশ ও চরিত্র। জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও, মানুষ ও সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া অসম্ভব নয়— এই কথা প্রমাণিত হয়েছে এই শতাব্দীর গোড়ার সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে দিয়ে।

আজও অন্য যে-কোনো যুগের মতোই মানুষ আর 'মানুষের সত্যে'র প্রতি উৎসাহী শিল্পীরা কাজ ক'রে চলেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই বিকল্প শিল্পধারা ব'য়ে চলেছে। এই বিকল্প শিল্পধারার কারুসঙ্ঘের পরিকল্পনা থেকে কিছু শিখবার আছে কি না দেখার জন্য কারুসঙ্ঘের কয়েকটি বিশেষ দিকের উল্লেখ করব :

ক. সংস্কৃতিচর্চাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক না-ক'রে সংঘবদ্ধ করা।

খ. সাংস্কৃতিক কর্মীদের সমবায় নীতির ভিত্তিতে আর্থিক দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর করা।

গ. কারুশিল্প ও কারিগরিবিদ্যার সঙ্গে চারুশিল্পের ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা।

ঘ. পরম্পরাগত 'গণশিল্প' ও লোকশিল্প থেকে রুচি ও সৌন্দর্যবোধের উপাদান সংগ্রহ করা।

আজকের যুগ ও শিল্পচর্চার পরিবেশের ওপর দাঁড়িয়ে বিকল্প শিল্পচর্চার পরিবেশ তৈরি হ'তে পারে কারুসঙ্ঘের দেখানো রাস্তাতেই। এই কারণেই কারুসঙ্ঘের পরিকল্পনা সে-যুগের থেকেও যেন আজকের যুগে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

পরিশিষ্ট

চিঠিপত্র

লেখকের বানান অবিকৃত রাখা হ'ল। যেখানে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি সেখানে বিন্দুচিহ্ন ব্যবহার করা হ'ল।

১.

১৮।৮।৩১

শান্তিনিকেতন

প্রিয় প্রভাত

তোমার একটা পত্রে তোমার সব খপর পাইলাম। মধ্যে কিঙ্কর ও বনবিহারি কলকাতায় গিয়েছিল। তাদের মুখেও তোমার সংবাদ পাইলাম। তাহারা আজ আশ্রমে ফিরেছে এবং গুরুসদয়বাবুর অর্ডারও পাইয়াছে।

মিউনিসিপালটা হতে পত্র আসিয়াছে আশ্বাষ দিয়ে মাত্র কোন পাকাপাকি খপর নাই আমি কার্টুন করে বসে আছি। তোমার কিতাবগুলা আমার নিকটই আছে যাহাকে ২ দিবার দিয়াছি।

আমাদের আশ্রমের সব খপর ভাল। এখন কেউই আর ছবি আঁকছে না। আমার গ্রীষ্মর ছুটিতে ৫ খানা ছবি হয়েছে এখনও কিছু আঁকছি না। বিনোদের চক্ষু ভালই আছে শীঘ্রই হঁসপাতাল হতে ফিরবে।

তোমার দেওয়া যে ১০০ টাকা কারুসঙ্গে জমা আছে তাহা হেমন্তবাবুকে দিব ঠিক করেছি তোমার মত পেলে তাহাকে দিয়া দিব। হেমন্তবাবু শীঘ্রই একবার সোধপুর যাবেন। কারন তাহার একটা সহকর্ম্মিকে তথায় কাপড় ছোপান ও ছাপান শিক্ষা দিতে লইয়া যাবেন। তাঁহার তথায় কি থাকিবার বন্দবস্ত হতে পারে যদি করিয়া দিতে পার ত বড় ভাল হয়। ঐ ছেলেটার কথা তোমায় হেমন্তবাবু (বল্লভপুরে খাদির কাজ করছেন) তোমায় বলেছিলেন। তুমি সোধপুরে একটা পত্র দিবে।

ভালবাসা জেন। ইতি

শ্রীনন্দলাল বসু

২.

প্রিয় প্রভাত
গতকাল তোমার পত্র পাইয়া পুরস্কারের লোভে তাড়াতাড়ী পত্র উত্তর দিয়াছি। আমি ভালই আছি। বাড়ীর সব ভালই আছে। যমুনার বাঁ হাত আজ তিনমাস হল বাইক হতে পড়ে ভেঙ্গে গেছে। ঠিক কনুইয়ের উপরের হাড়খানা ভাঙিয়া গিয়াছিল। ডাক্তার ললিতবাবুকে দেখান হয়েছিল। এখন হাড় যোড়া লেগেছে কিন্তু হাতটা পুরা খুলতে পারে না ডাক্তাররা চেষ্টা করছে। তাহারা আশা ছাড়েন নাই। বলছেন ঠিক হয়ে যাবে। গোরা matric ফেল করেছে। তাহাকে যাদবপুরে ভর্তী করে দিয়েছি। বিশুর আজ তিনমাস হল পত্র পাই নাই কারণ কিছু বুঝতে পারছিনা। Hoshiকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম তিনি টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন, "বিশু জাপান ছেড়েছে ২০ সেপ্‌টেম্বর, ভাল আছে", এই মাত্র। কবে পৌছাবে কোন জাহাজে কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার বৌদির শরীর বড় ভাল নয়, নানা অসুখে চিন্তায় শরীর ভাল থাকে না। আমাদের নূতনের মধ্যে এখানে আমাদের একটী নূতন বাড়ী তৈয়ার হয়েছে। কলিকাতা বাড়ীখানা বিক্রয় করার চেষ্টা হচ্ছে। আর. Co. কাগজ হাজার ২ই যা ছিল বিক্রয় করে এই কির্ত্তি করেছি। ঠিক করলাম কি ভুল করলাম বুঝতে পারলাম না। মেসোজী ত বাড়ী ফাঁদেন নাই, জানিনা বাড়ী করবেন কিনা। উপস্থিত তিনি আহমদাবাদে শ্রীমতীর নিকট গিয়াছেন। আসবেন কিনা জানি না।
ইহার পর আমার কাজের কথা বলি। আমি নিজে বিশেষ কাজ কিছু করি নাই। কেবল Libraryর নিচের বারান্দায় ফ্রেস্কোর (জয়পুর) কাজ হয়েছে। উহার সব ডিজাইন আমারই। ছবির অংশ আমি করিয়াছি ও অলঙ্কারিক দিকটা ছোট মেয়েদের ছবি হতে নেওয়া। দুখানি প্যানেল ছাড়া সবগুলা নূতন, আশ্রমেরই কথা ছবিতে দিয়েছি।
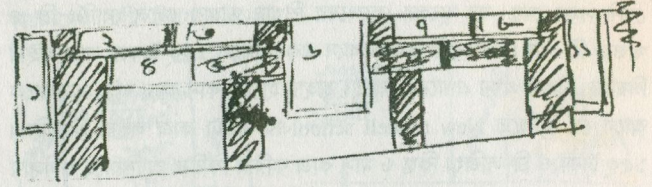
১- নটীর পুজার ছবি। ২, ৩— বর্ষায় খোয়াইর দৃষ্য। ৪।৫- নৃত্যের ছবি— (কি নাম দেব জানি না) ৬ শিশুর জন্ম (পুরাতন ছবি চৈতন্যদেবের জন্ম ছবিটা বড় করে আঁকা। ৭।৮- গোচারণ। ৯, ১০ আশ্রমের নানা কাজ অধ্যয়ণ ইত্যাদি। ১১- গৃহমার্জন ইহা আমার পুরান একটা woodprint হতে নেওয়া। ইহা ছাড়া চৈতন্যর শেষ অধ্যাপনা। ইহা পাইনে এই ছবিখানি গনেনমহারাজের নিকট আছে তাঁহাকে দিয়াছি। আর ঐ ফ্রেস্কোর কার্টুনগুলী গনেনমহারাজের নিকট আছে। তোমার অবসর মত তাহার নিকট গেলে তিনি দেখাবেন। ইহা ছাড়া শিবের বিষপান, নটীর পূজার ছবির লাইন ড্রইং ইত্যাদি ডাক্তারদের ফিস্ বাবদ করতে হয়েছে। ডাক্তাররা দয়া করে ছবি নিয়ে আমায় নিস্কৃতি দিয়েছেন। আর মহিষমর্দিনীর ছবি তুমি ত দেখেইছ উহা বেশ বড় ছোট করে ছেপে একটু নিরেশ দেখাচ্ছে। ইহাও গনেনমহারাজের নিকট আছে। তারপর কাজ বন্ধ হটাত মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। সব নিজের কথাই বল্লাম, নিজের কথা বলতেই অভ্যস্ত হয়েছি।
ইহার পর কলাভবনের উপস্থিত অবস্থার কথা বলি।—
কলাভবনে উপস্থিত ছাত্রছাত্রি মিলে ৩১ জন। ছেলে ও মেয়ে আধা আধি। বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রি মাত্র ছেলে ৬ জন + ৫ জন। বাকি সব গুজরাঠি ছেলেমেয়ে। একজন ডচ্ মেয়ে এসেছেন। কাজ শিখানর ভিতর আমি, বিনোদ, সুরেন, মেসোজি। কাজের এখন রুটিন বেঁধেছি। আমি সকালে বসে, সকলের কাজ দেখে, ডাক্তারের Prescription লিখার মত করে প্রত্যেকের খাতায় ছাপান ফর্ম্মে লিখে দিই কে কি করবে। মোট কথা শিখানর উদ্দেশ্য একই আছে তবে এখন মনে হচ্ছে কতকটা ... করা হয়েছে। অন্ততঃ প্রথম শিক্ষার্থির জন্য। হিরেন Libraryর কাজে বিনোদকে সাহায্য করে কারন বিনোদ staffএর কাজে

বেশি সময় দেয়। যদু স্কুলের ছেলেদের শিখায় তাহার বদলে বোর্ডিং ফ্রি ও খাওয়া ফ্রি পায়। বনবিহারি অহমদাবাদে একটা মিলে ১০০্ টাকার কাজ লইয়া গিয়াছে। কিঙ্কর এখন এখানেই আছে। তাহার হাতে কোন কাজ নাই। মাসকতক আগে সে দিল্লিতে New modell schoolএর একটা কাজ লইয়া গিয়াছিল। ১৫০্ টাকা ও ফ্রি লজিং। কিন্তু ৬ মাস কাজ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিলাম বনিবনাও হয় নাই। সারদার কাজে officiating করার জন্য গিয়াছিলেন। সুধীর খাস্তগির উপস্থিত Gowaliar Sindhia স্কুলে ২০০্ টাকা মাইনায় একটা কাজ লইয়া গিয়াছেন। মনি রায় চৌধুরী ত sindhএ একটা কাজ লইয়া গিয়াছেন তুমি জান। নিশিকান্ত উপস্থিত বালি স্কুলে কাজ করে, বনবিহারির বাড়ীতে থাকে। কলাভবনে পুরাতন ছাত্রের মধ্যে তুমি যা জান— যমুনা, নিবেদিতা, হিরেন, শিশির, শরদেন্দু, শৈলেশচন্দ্র, নিহার (নিভার দেওর) আর সব নূতন এবং প্রায় সবই বাচ্চা ১৬ হতে ২০ বৎসর বয়স। তবে সব ছেলেই ভাল। আমারই শক্তি কম হয়ে আসছে, সকলের সঙ্গে এখন তেমন মিল হয় নাই খুব চেষ্টা করছি যাহাতে সকলকে সমান প্রাণ-মন দিতে পারি। সকলেই বিদেশি হওয়ায় ও ভাষা ইঙ্গরাজি হওয়ায় মনের কথা বলা বড় কঠিন হয়। এখন বিনোদ ও মেসোজি ছাড়া আমার আর কেহ সঙ্গি নাই। তার মধ্যে মেসোজি খস্‌লেন। আমি প্রাণপন চেষ্টা করছি নিজের ছবি আঁকবার জন্য সময় করে উঠতে পারছি না।

হিরেন যে ছুঁচের ফোঁড় বইখানি ছাপাইয়াছে তাহার খরচা বিশ্বভারতি দিয়াছে সুরেনবাবু ইহার বন্দবস্ত করিয়া দিয়াছেন। কারুসঙ্গে কিছু টাকা জমা হয়েছে আমার মনে হয় আর দু-একমাস পরে উহাকে বলিব বহিখানির খরচা আমাদের নিকট লইয়া তাহার নিজের নামে পরে করে নেবে। আর বহি সে বার করবে এবার আমি কারুসঙ্গ হতে দিবার চেষ্টা করব। কিঙ্করের, বেচারার টাকা অর্দ্ধেন্দুবাবু দিলেন না, উপরন্ত আমি আনিতে গিয়াছিলাম, অপমানিত হয়ে এসেছি। অমেরিকার ছবিগুলো ফেরত দিয়াছেন। তোমার কি ছবি ছিল, পাই নাই ত। লিখ কি ছবি ছিল। গুরুসদয় বাবুর বহির দঃ ২০০্ টাকার মধ্যে ১০০্ টাকা আদায় হয়েছে মাত্র আবার পত্র দেওয়া হয়েছে এখন জবাব পাই নাই। কারুসঙ্গের হিঃ পত্র মেসোজি রেখেছেন। হিঃ বেশ পরিস্কার আছে।

কারুসঙ্গের জমি বিষয় বলি।

কারুসঙ্গের তিনবিঘা জমি আছে তাহার মধ্যে আর দু বিঘা বাকি আছে যে কেহ Artist কারুসঙ্গের মেম্বর লইবে তাহাকে দিব। কিন্তু তুমি একবার এখানে না এলে আমি কিছুই ঠিক করব না। অনেক পরামর্শ আছে। কারুসঙ্গ মরে নাই। আমাদের সঙ্গেই মরবে। ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না। আমি এখন ভরসা রাখি। সন্তোষ এখন সুরুলে (গৌরীর স্বামী) কাজ করছে। ইন্দুর কাজে উহারা দুজনে মিলিয়া কাজ করছে। বুলবুলী ও তাহার ছোট টুনটুনী ভালই আছে। Anatomyর ক্লাস নিয়মিত হচ্ছে। শিখানও পূর্ব্বাপেক্ষা ভালই হচ্ছে তবে একটু নিরস লাগছে। তুমি ত জান কারুসঙ্গের যা যা কাজ উহাঁরাই করিবেন স্থির করিয়াছেন, তবে এখন একটু ঢিলা পড়েছে। তবে আমি সল্‌তেটা জ্বালাইয়া রাখিয়াছি। মাঝে ২ বিজ্ঞাপনও দিয়ে দিই। Oriental Art society journalএতে বড় এক পাতায় উহার বিজ্ঞাপন দিয়াছে। Frescoর চেষ্টাও এখন করছি। ছুটীতে করব বলে অনেককে খোঁজ করতে বলেছি। আর পারি না, বয়স হয়েছে না মন অবসাদ জানি না তেমন উৎসাহ নাই।

এবারে স্কুলের কথা— স্কুল পূর্ব্বের মতই তবে টানাটানি চলছে। কলেজটা আবার ঠেলা দিয়ে উঠেছে। গুরুদেবের শরীর ভালই আছে— মাঝে তাসের দেশ নাটকটা কলকাতায় হয়ে গেল মন্দ হয় নাই তবে টাকা বেশি উঠে নাই। আবার বম্বে নভেম্বর মাসে যাওয়া হবে সাপমোচন নাটক করবার জন্য, উদ্দেশ্য টাকা তুলতে।

ধীরেন বর্ম্মন আমাদের কলাভবনে আসি ২ করছেন। জানি না কি হয়। কলাভবনের ছেলেরা শ্রিপল্লিতে ডরমেটরি করেছে। কালিমোহনবাবুরা যেখানে থাকতেন।

বিনোদবাবু এখানেই আছেন। ছবি মাঝে ২ করছেন। বেশ একটু নিস্তব্ধ ভাব হয়েছে চুপচাপ কাজ করে। তাহার ... (ননিবালা একটা বাড়ী করেছেন।) সেই বাড়ীতে ভাড়া লইয়া আছেন। বিনোদের খাবার কষ্ট অনেকটা ঘুচেছে। ফুলকাটা তিনপার্ট বাহির হয়েছে। রুপাবলি দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হয়েছে। তুমি কোন বহি খরিদ কর না আমি শীঘ্র সব গুলা পাঠাইয়া দিব। হিরেন এখানে নাই আসিলেই তাহার ছুচের ফোঁড়টা পাঠাইয়া দিব। ফুলকাটা মন্দ বিক্রয় হয় না। মোটের উপর ছাপার খরচা উঠে যাবে। সীবনীর কোন হিং পাই না তাহারা বলে রসিদ দেখাতে। আমি ত কারুসঙ্গে, কোন রসিদ খুঁজিয়া পাই নাই তোমার কাছে যদি থাকে তবে তুমিই একবার যেও কি হল। লোকটা সুবিধার নয়।

৩.

পোস্ট মার্ক : ১৫ জুন ১৯৩৯, শান্তিনিকেতন
১৬ জুন ১৯৩৯, দমদম

প্রভাত—

শৈলেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে (ক্ষিতিমোহন বাবুর জামাইকে) কারুসঙ্গের (১।।) বিঘা জমি দলি[ল] করে ও রেজিস্টরি করে দেওয়া হয়ে গেছে। খরচা উপস্থিত, ৫।। + ৩।। + ১।। লেগেছে। দলিল লিখাই খরচ কিছু দিতে হবে টাকা ৪ হয়ত লাগবে। টাকা ১৪।১৫ লাগবে। এই টাকার অর্দ্ধেক তোমায় ও অর্দ্ধেক শৈলেনবাবুকে দিতে হবে। শৈলেনবাবু কলিকাতা গেছেন— এই ঠিকানায় তুমি গিয়ে তাহার নিকট বাকি টাকা আন্‌বে।

20. Raja Basanta Ray Road
P.O. Kalighat
Calcutta.

আর এখানে এসে আমার নিকট টাকাটা নিয়ে যাবে।— ও তোমার জমিটার দলিলটা করে নিবে।

N L Bose
Santiniketan

KARU-SANGHA

Binodebehari Mukherjee

Karu-Sangha came into existence thirty years ago, sponsored by the Kala-Bhavana artists of the time.

The main object of the Sangha was to encourage independent creativity and provide for that necessary funds. Sri Provat Mohan Banerjee was the principal force behind the founding of the Sangha. A chunk of land by the side of Sriniketan Road was purchased through his help. The idea was that the artists would buy each a bigha of land on instalment basis and at a low price, and form an artists' colony at Santiniketan. Another scheme was to secure orders and ear-mark the sum to give loans to artists who, in their turn, were required to pay the money back through work. Money obtained from the poster Acharya Nandalal did for the competition organised by Calcutta Corporation, the relief-work done by Sri Ramkinkar for Sri O. C. Ganguly's house, book illustrations, publication of a book of designs (Sm. Indusudha Ghosh) etc. were utilised for the purpose.

The Sangha ran well for some time but the plans had to be dropped for various reasons. In 1932, Sri Banerjee joined the Salt Movement and his absence told on the Sangha. Sri Manindrabhusan Gupta for some time acted as its Secretary.

Years later, in 1961, the Sangha was revived by some women workers under the leadership of Sm. Jamuna Sen. At Taladhwaj, adjacent to the Mandir at Santiniketan, an office for the Sangha was established, where it is functioning now. The use of the house, incidentally, has been permitted by Visva-Bharati free of charge and for indefinite period. The Sangha has now 45 members. Although all of them are women ashramites, any ex-student is eligible for membership. The monthly fee is only half a rupee. A member can come any time to Taladhwaj and do batik-work, various facilities for which are provided.

The Sangha aims at encouraging members to do handicraft at their spare time from home-chores, and also to market these.

The Sangha accepts orders for work. Batik work really has been the main-stay of the Sangha. But the need for expansion of activities is there. It may be desirable to undertake those jobs that go well and easily with batik work. The Sangha artists often get the actual printing done in Calcutta. The Sangha is as much connected with urban localities as with the rural. For several years now Sm. Ila Ghosh, a prominent member of the Sangha, has inspired artistic work on *kantha*. This enterprise, comprising of fifty artists— villagers and refugees— could be taken over by Karu-Sangha. It would help all parties concerned. Many other activities could be started in villages and the artists might hit upon other creative ideas.

A speciality that the Sangha enjoys is that it remains business-like, but has not been commercialised. One reason for this is the independence of the members of earnings from its sale. There may not be many such organisations in the country and it is highly desirable that Karu-Sangha should grow and prosper.

Karu-Sangha [WOMEN ARTISTS' ASSOCIATION, SANTINIKETAN] Exhibition of Arts and Crafts, 10th August 1968 at ACADEMY OF FINE ARTS, CALCUTTA.

কারু-সঙ্ঘ

শ্রীমতী ইন্দুসুধা ঘোষ

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

বুক কোম্পানী

৪।৩ বি কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা।

মূল্য—আট আনা

পরিচয়

শ্রীমতী ইন্দুসুধার আঁকা এই সেলায়ের নমুনাগুলি শুধু ছাপার কাগজে ও কালিতে থাকবার জিনিষ নয়, এগুলির যথাযথ ও যথোপযুক্ত স্থান হচ্ছে মেয়েদের অঙ্গরাখায়। সোনা ও বিচিত্র বর্ণের সূত্রে গাঁথা হওয়াতেই এদের সার্থকতা। আমি শ্রীমতী ইন্দুসুধার এই শিল্প ও কারুকার্য্যের সম্যকরূপ আদর কামনা করি।

কলিকাতা
দোলপূর্ণিমা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রংয়ের ব্যবহার

বর্ণ বিন্যাস অনেকটা ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভর করে। এরজন্য ধরাবাঁধা নিয়ম কিছু হতে পারে না। তবে ব্যক্তিগত ভাবে রংয়ের ব্যবহার আমার যেরূপ ভাল মনে হয় লিখ্‌ছি।

সাধারণতঃ একটা সেলাই দুটো রং দিয়ে করলেই ভাল হয়। তৃতীয় রং কিছু দিতে চাইলে খুব কম দিতে হবে।

- নীল রং প্রধান থাকলে তার সঙ্গে হল্‌দে (বা সোনালি মুগা) ও সাদা, লাল রং প্রধান থাকলে তার সঙ্গে হল্‌দে (বা সোনালি মুগা), সাদা ও কালো (ঘন বেগুনি, ঘন খয়েরি, ঘন নীল, ঘন আল্‌তা) এবং হল্‌দে রং প্রধান থাকলে তার সঙ্গে লাল (সিঁদুরে বা আল্‌তা) নীল এবং কালো (ঘন খয়েরি, ঘন বেগুনি) ও সবুজ ব্যবহার করা চল্‌বে।

লাল কালো আর তার সঙ্গে সামান্য হল্‌দে যথাক্রমে ব্যবহার করা যায়। কালো, হল্‌দে তার সঙ্গে অল্প লাল, এবং হল্‌দে লাল ও তার সঙ্গে অল্প কালো বেশ মানায়। শুধু লাল আর কালোতেও ভাল হয়।

কাল্‌চে লাল আর সোনালি (মুগা) খুব মানায়, তার সঙ্গে সাদাটাও দেওয়া যায়। সোনালিটা কালোর সঙ্গেও খুব খোলে।

আস্‌মানি নীল আর কালো বেশ মানায়, তার সঙ্গে অল্প সাদাও চলে।

কাল্‌চে সবুজের (কাঁঠাল পাতার রং) সঙ্গে সোনালি (মুগা) খুব খোলে, খয়েরি ও তেঁতুল বীজের রংএর সঙ্গেও মুগা মানায়।

ধানি সবুজ আর কালো অথবা অপরাজিতার নীল সাদার উপর ভাল দেখায়।

মোটামুটি রংয়ে কয়েকটা রংয়ের বিষয় বলা হ'ল কিন্তু রং মানানোটা রংয়ের আয়তন ও ঘনত্বের উপর অনেকটা নির্ভর করে। রংয়ের মানান অসংখ্য রকম।

রং সাজাতে হলে প্রকৃতির কোনো জিনিষের মধ্যে থেকে নেওয়াই ভাল। যেমন ডালিমফুলের লালের সঙ্গে তার ভিতরের রেণুর সোনালিটি মানায়। এখানে লাল কতখানি এবং কি রকম ঘন ও তার সঙ্গে কি রকম ঘন কতখানি সোনালি মানি[illegible] করতে হবে।

প্রকাশক—শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক—কারুসঙ্ঘ, শান্তিনিকেতন।
প্রিণ্টার—হরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ১১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারুসঙ্ঘের বিজ্ঞাপন
Journal of the Indian Society of Oriental Art,
Vol. I, No. 1. June 1933.